সম্পাদকীয়

সফল হোক ৮৫তম সালানা জলসা

সারা বিশ্ব চরম অবক্ষয়ের দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে। কুরআন মজীদের শিক্ষা ও আদর্শের সঠিক ব্যাখ্যা ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর সফল বাস্তবায়নই পারে এই অবক্ষয় রোধ করতে। মানুষকে পাক-পবিত্র করার আল্লাহ্ প্রদত্ত পথ সীরাতে মুস্তাকীম তথা সরল পথ হলো ইসলাম। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)কে সর্বশক্তিমান ও সর্বকরুণার আঁধার আল্লাহ্ তাআলা ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ রূপে এ ধরায় পুণরায় ইসলামের অনুপম শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতে প্রেরণ করেছেন। সুষ্ঠু ও ব্যাপকভাবে এ মহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে তাঁর অন্যতম কর্মকান্ড হিসেবে তিনি সালানা জলসার প্রবর্তন করেন। আজ থেকে ১১৮ বছর পূর্বে আধ্যাত্মিকতা চর্চার এক মিলন মেলার সূচনা করেছিলেন তিনি 'জলসা সালানা' নামে। কাদিয়ানের নিভৃত এক গ্রাম থেকে যে জলসা শুরু হয়েছিল আজ সেই জলসার কার্যক্রম বিশ্বের প্রায় দুইশত দেশে হাজার হাজার স্থানে লাখো লাখো ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাগমে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয়ে চলছে।

মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশও এরই ধারাবাহিকতায় ৮৫তম জলসা সালানা উদযাপন করার সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছে ১৩, ১৪, ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ ঈসাব্দ।

জলসায় আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) দোয়া করেছেন ঃ "যারা এ লিল্লাহী জলসার উদ্দেশ্যে সফর করেন, খোদা তাদের সহায় হোন, অসীম প্রতিদান দিন, তাদের ওপর দয়া পরবশ হোন, তাদের সকল সমস্যা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটান, সকল দু:খ-কষ্ট হতে তাদেরকে নিষ্কৃতি দান করুন, তাদের সমুদয় শুভ কামনা ও কার্য সিদ্ধির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করে দিন এবং হাশরের দিন তাদেরকে খোদা তাঁর সেই বান্দাদের সঙ্গে উত্থিত করুন যাদের ওপর তাঁর ফযল ও রহমত বর্ষিত হয়েছে এবং সফর সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! হে মর্যাদাবান ও দানশীল এবং পরম দয়াবান ও সমস্যা সমাধানকারী খোদা! এ সব দোয়াই তুমি কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে প্রাধান্য দান কর, কেননা সকল শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী একমাত্র তুমিই; আমীন, সুম্মা আমীন।" (বিজ্ঞাপন : ৭ ডিসেম্বর ১৮৯২)

আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ উদযাপনের এ কালে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যুগ খলীফার গৌরব দীপ্ত উপস্থিতিতে অসাধারণ শান শওকত ও মর্যাদার সাথে জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩১ জানুয়ারী ও ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৯

সূচী পত্র — *পৃষ্ঠা নং*

- **কুরআন শরীফ** — ৪
- **হাদীস শরীফ** — ৫
- **অমৃত বাণী** — ৬
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** — ৭-১২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** — ১৩-১৭
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- ***জুমুআর খুতবা ঃ*** — ১৮-২২
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- **আল্লাহ্ তাআলার কাছে মুসলমানদের অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত** — ২৩-২৫
  হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)
- **প্রখ্যাত ধর্মবেত্তা হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)** — ২৬-৩৩
  মূল: মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)
  অনুবাদ : মাওলানা ফিরোজ আলম
- **মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অসাধারণ কর্মময় জীবনের এক ঝলক** — ৩৪-৩৯
- **হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর** — ৪০-৪৪
  মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
- **ইন্টারন্যাশনাল প্রেস রিলিজ** — ৪৫-৪৬
- **মসজিদে যারা জুতা ছোড়াছুড়ি করে তারা কোন মুসলমান?** — ৪৭-৪৮
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- **সংবাদ** — ৪৯
- **কৃষি পাতা** — ৫০

প্রচ্ছদ : তারেক আহমদ (সবুজ)

এ বছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের জলসার সমাপ্তি অধিবেশন (১৫ ফেব্রুয়ারী) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আশিস লাভে বিশেষ বরকত মন্ডিত হবে । সেদিন মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ায় সম্প্রচারিত LIVE প্রোগ্রামে হুযূর (আই.) বাংলাদেশের এই জলসায় যোগদানকারীদের সম্বোধন করে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করবেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের আহমদীরা তাদের প্রাণপ্রিয় খলীফার পবিত্র সান্নিধ্য লাভে প্রতিবেশী দেশ ভারতে যাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। তবে ভারতে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে যেতে না পারায় তারা দু:খ ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে। তাই হুযুরের মধুময় বাণী দ্বারা তারা আপ্লুত হবে, হবে প্রশান্তিময়। অধীর অপেক্ষা এখন তারই জন্য, তবে অন্তর তৃপ্ত হবে কেবল তাঁরই (আই.) পবিত্র সান্নিধ্যলাভে।

সূরা হুদ-১১

৩৩। তারা বললো, 'হে নূহ্! নিশ্চয় তুমি আমাদের সাথে তর্ক করেছ এবং অনেক তর্ক করেছ। অতএব তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তুমি আমাদের যে (আযাবের) ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের এনে দেখাও।'

قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٣﴾

৩৪। তারা বললো, নিশ্চয় আল্লাহ্ চাইলে তিনিই তা তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। আর তোমরা কখনো (তাঁকে) ব্যর্থ করতে পারবে না[১৩১১]।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আর আল্লাহ্ যদি তোমাদের ধ্বংস করতে চান আমি তোমাদের যতই উপদেশ দিতে চাই না কেন আমার উপদেশ তোমাদের কোন কাজে আসবে না[১৩১২]। তিনিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।'

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٣٥﴾

১৩১১। এই আয়াতে শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে তিনটি নিয়ম ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ (১) নির্ধারিত শাস্তি সংঘটিত হওয়ার প্রকৃত সময় সাধারণত: প্রকাশ করা হয় না, (২) এবং সেই শাস্তি প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ ও অপরাধীর মনের পরিবর্তন অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা যদি চান, তা পরিবর্তন করে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন অথবা রহিত করে দেন; (৩) এতদ্বিষয়ে অর্থাৎ শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে কোন পরিবর্তনই হউক না কেন আল্লাহ্ তাআলার অলংঘনীয় উদ্দেশ্য কখনই পরিবর্তিত হয় না। কারণ অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য কোন ভাবেই ব্যর্থ করতে পারে না।

১৩১২। সাধারণ্যে প্রচলিত ভুল ধারণা যে, নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁর ওপর ঈমান আনে নাই বলে ক্রুদ্ধ হয়ে নূহ (আ.) অবিশ্বাসীগণের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করেছিলেন (৭১:২৭-২৮), এই আয়াত উক্ত ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করছে। কারণ এতে দেখা যায় যে, নূহ (আ.) তাঁর নিজস্ব ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে তাদের ধ্বংসের জন্য বদ্‌দোয়া করেন নি, বরং আল্লাহ্‌ই তাঁকে এরূপ করতে বলেছেন।

হাদীস শরীফ
জলসায় যোগদানের কল্যাণ

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ তাআলার কিছু উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ভ্রমণরত ফিরিশ্‌তা সর্বদা এমন মজলিসের সন্ধানে থাকেন যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয়। অতএব যখন তারা এমন মজলিসের সন্ধান পান যেখানে (আল্লাহ্‌র) যিক্‌র হতে থাকে তাঁরা তাদের সাথে বসে পড়েন এবং নিজেদের পাখনা দ্বারা তারা একে অপরকে আবৃত করেন। এমনকি তাদের এবং নিকটবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যায়। (টীকা ঃ এ রকম মজলিসের ওপর খোদাতাআলা যে কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে থাকেন তা-ই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপকভাবে বর্ণনা করেছেন, এটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না)। অতঃপর যখন লোকেরা ঐ মজলিস হতে উঠে যায় তখন ফিরিশ্‌তাগণও আকাশে চলে যায়। (সেখানে) সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যিনি তাদের অপেক্ষা বেশি জানেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা হতে এসেছ?' তখন তারা উত্তর দেন, 'তোমারই ঐ সকল বান্দার নিকট হতে এসেছি, যারা পৃথিবীতে তোমার গুণকীর্তন করতেছিল, তোমার একত্ব ঘোষণা করছিল, তোমার প্রশংসায় মুখরিত ছিল এবং তোমার নিকট যাচঞা করছিল।' তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি যাচঞা করছিল'? ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'তারা তোমার নিকট তোমার জান্নাত যাচঞা করছিল'। আল্লাহ্ পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' ফিরিশ্‌তাগণ উত্তর দেন, 'হে প্রভু! না তারা দেখে নাই।' তিনি বলেন, 'কী অবস্থা হত যদি তারা জান্নাত দেখত!' তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট আশ্রয়ও প্রার্থনা করতেছিল।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার আগুন দেখেছে?' তারা বলেন, 'না তারা তা দেখে নি।' তিনি বলেন, 'তাদের কি অবস্থা হত যদি তারা আমার আগুন দেখত।' তখন তারা বলেন, 'তারা তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছিল।' তিনি বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। তারা আমার কাছে যা যাচঞা করেছে তা আমি তাদেরকে দান করলাম এবং তারা যা হতে আশ্রয় চেয়েছিল তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।' তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্যে একজন তো অত্যন্ত গুনাহ্‌গার ছিল যে ঐ জায়গায় অতিক্রম করছিল এবং সে তাদের সাথে দর্শকের ন্যায় বসে গেল।' 'তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা করে দিলাম; কেননা, তারাতো ঐ সকল আশিস-প্রাপ্ত লোক যে, তাদের সাথে যে-ই বসুক না কেন সেও বঞ্চিত হবে না।" (মুসলিম কিতবুয্ যিক্‌র)।

অমৃতবাণী

সালানা জলসার গুরুত্ব

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

সালানা জলসার গুরুত্ব ও মহান উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বহুবিধ কল্যাণময় উদ্দেশ্য ও উপকরণ সমন্বিত এই জলসার পথ খরচের সামর্থ যারা রাখেন এইরূপ সকল ব্যক্তিরই যোগদান করা আবশ্যকীয়। তারা যেন প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র ইত্যাদিও সঙ্গে আনেন এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের (সন্তুষ্টি লাভের) পথে সামান্য সামান্য বাধা-বিপত্তিকে ভ্রুক্ষেপ না করেন। খোদা তাআলা মুখলেস (খাঁটি ও সরল) ব্যক্তিগণকে, পদে পদে সওয়াব প্রদান করে থাকেন এবং তাঁর পথে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট বৃথা যায় না।

পুনঃ লিখছি যে, এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করবেন না। এটা সেই বিষয়, যার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমার মর্যাদা বৃদ্ধির ওপর স্থাপিত। এর ভিত্তি আল্লাহ্ তাআলা নিজ হাতে রেখেছেন এবং এর জন্য জাতিবর্গকে প্রস্তুত করেছেন যারা অচিরেই এসে যোগদান করবে। কেননা এটা সেই সর্বশক্তিমান খোদার কার্য যাঁর সম্মুখে কোন কিছু অসম্ভব নয়।

জলসার উদ্দেশ্যাবলী ঃ

(১) এই জলসার একটি মহৎ উদ্দেশ্য এটাও যে, প্রত্যেক মুখলেস (নিষ্ঠাবান) যেন প্রত্যক্ষভাবে দ্বীনি কল্যাণ লাভের সুযোগ পান এবং তার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয় এবং ঈমান ও মা'রেফতে সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করে।

(২) একমাত্র জ্ঞান-সঞ্চার ও ইসলামের সাহায্যকল্পে পারস্পরিক পরামর্শ এবং ভ্রাতৃত্ব-মিলনের উদ্দেশ্যেই এই (মহতী) জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয়েছে।

জলসায় যোগদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়া ঃ

অবশেষে আমি দোয়া করছি, আল্লাহ তাআলা যেন এই লিল্লাহী (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে অনুষ্ঠিতব্য) জলসার উদ্দেশ্যে সফর অবলম্বনকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সাথী হোন, তাদেরকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করেন, সকল বাধা-বিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট এবং উদ্বেগজনক অবস্থা তাদের জন্য সহজ করে দেন, তাদের সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর করেন, তাদেরকে প্রত্যেক বিপদ ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করেন, তাদের সকল শুভ কামনা পূরণের পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ও সুগম করেন ও পরকালে তাদেরকে সেই সব বান্দার সাথে উত্থিত করেন যাদের ওপর তাঁর বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বিরাজ করে এবং তাদের সফরকালীন অনুপস্থিতিতে তাদের স্থলাভিষিক্ত হোন।

হে খোদা! হে মর্যাদা ও বদান্যতার আধার! করুণা কর ও বাধা-বিপত্তি নিরসনকারী! এই দোয়াসমূহ কবুল কর এবং আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর উজ্জ্বল ঐশী নিদর্শনাবলী সহকারে বিজয় দান করো। কেননা, সকল প্রকার শক্তি ও ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী তুমিই । আমীন! পুনঃ আমীন!!

(ইশতেহার, ৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২ ইং)

এই দোয়াটি পাঠ করা প্রত্যেক আহমদীর দৈনন্দিন রীতি হওয়া উচিত। رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

এই দোয়া করার সময় সর্বদা একান্ত সচেতনতার সাথে পথের হোঁচট থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জামাতভূক্ত হয়েছি বলে আমাদের ভ্রুক্ষেপহীন হওয়া উচিত নয় বরং পূর্বের তুলনায় অধিকহারে খোদার রহমত সন্ধান করা উচিত।

কাদিয়ানের বার্ষিক জলসায় যোগদান এবং ভারতের বিভিন্ন জামাত পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পূর্বে জামাতের সদস্যদের দোয়ার আহ্বান।

মোকাররম বশির আহমদ সাহেব মুহার (দরবেশ কাদিয়ান)-এর ইন্তেকাল এবং মোকাররম মোহাম্মদ গযন্‌ফর চাট্‌ঠা সাহেবের শাহাদতের বিবরণ ও গায়েবানা জানাযার নামায।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (সূরা আল্ ইমরান:৯)

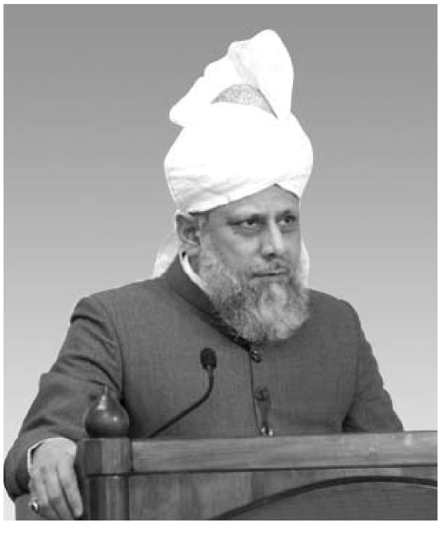

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজীদে প্রদত্ত ২১শে নভেম্বর,২০০৮-এর (২১শে নবুয়ত, ১৩৮৭ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

অর্থঃ 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিওনা এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত দান কর, নিশ্চই তুমি মহান দাতা।' যে আয়াতটি আমি এখন তেলাওয়াত করেছি আপনারা এর অনুবাদও শুনেছেন। এতে খোদার ওয়াহাব সিফত বা বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে নিজ ঈমানের দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা হয়েছে। প্রধানত: তুমি আমাদেরকে যুগ ইমামকে মানার যে সুযোগ দিয়েছে, মহানবী (সা:)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যায়নের যে সৌভাগ্য তুমি আমাদেরকে দিয়েছ। হে খোদা! তুমি তোমার প্রিয়দের দোয়াকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়ে মহানবী (সা:)-এর উম্মতের ভেতর শেষ যুগে তাঁর (সা:) যে নিষ্ঠাবান দাসকে প্রেরণ করেছ তুমি কৃপা করত: আপন একান্ত করুণায় আমাদেরকে তার জামাতর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছ। এরপর হে খোদা! তোমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা মহানবী (সা:)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যা নিঃসন্দেহে তিনি (সা:) তোমার পক্ষ থেকে অবহিত হয়ে করেছিলেন; সে ভবিষ্যদ্বাণী হলো মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর পর খিলাফতের চিরস্থায়ী ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকলে সেই কল্যাণরাজী লাভ হবে যা এই মসীহ্ মওউদ ও মাহদীর জামাতের জন্য নির্ধারিত। হে খোদা! তুমি আমাদের উপর করুণা করত: আমাদেরকে এই ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট করেছ। আমাদের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তির কারণে তোমার দেয়া নিয়ামতরাজি থেকে আমাদের কখনও বঞ্চিত কর না।

মানুষ মাত্রই ভুল করে। ভুলভ্রান্তি হয়েই থাকে। আমরা বিনতভাবে তোমার নিকট আকুতি করছি, কখনও এ কারণে বা কোন অহংকার, দাম্ভিকতা বা আত্মশ্লাঘার কারণে বা অন্য কোনভাবে আমাদের অপকর্মের ফলশ্রুতিতে সেদিন যেন আমাদের জীবনে না আসে যা আমাদের হৃদয়কে বক্র করে দিতে পারে বা আমাদের ভেতর যেন এমন বক্রতা সৃষ্টি না হয় যার অশুভ ছায়ায় আমরা তোমার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় কোন কর্ম করে বসব যা তোমার রহমত থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারে। সুতরাং আমাদেরকে এমন অশুভ ও অলক্ষুণে সময় থেকে রক্ষা করো।

এরপর কুরআনের এই উৎকর্ষ দোয়ায় কেবল খোদার কৃপা থেকে বঞ্চিত না থাকার দোয়াই শিখানো হয়নি বরং একজন মু'মিনকে এ দোয়াও শিখানো হয়েছে যে, হেদায়াতের উপর কেবল প্রতিষ্ঠিতই থাকবে না বরং এ দোয়া কর যে, 'হে খোদা! তোমার নিজ সন্নিধান থেকে রহমত দান কর আর তোমার রহমতের সেই চাদরে আবৃত কর যা সকল অনিষ্ট থেকে আমাদের হিফাযত করবে এবং আমাদের ঈমানকে ক্রমশ: দৃঢ় করবে। অব্যাহতভাবে আমরা যেন ঈমানে উন্নতি করতে পারি, বিশ্বাসেও যেন উন্নতি করে যেতে পারি। আমরা যেন তাক্ওয়া এবং খোদাভীতির ক্ষেত্রে উন্নতি করে যেতে পারি আর আমাদের প্রত্যেক আগত দিন ঈমান এবং তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দিনের তুলনায় আমাদেরকে অগ্রগামী রাখে।

অতএব এই আকর্ষণীয় দোয়া প্রত্যেক আহমদীর দৈনন্দিন জীবনের রীতি হওয়া উচিত। যদি সত্যিকার অর্থে এটি আমাদের রীতি হয়ে থাকে তাহলে আমরা সচেতনভাবে স্বীয় দুর্বলতার উপর দৃষ্টি রাখতে পারবো আর ইবাদতের প্রতিও আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে একইসাথে আমাদের ইবাদত ও নামাযের রক্ষণাবেক্ষণও নিশ্চিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ নামাযও আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবে। আর আমরা এমন কর্মে সচেষ্ট হবো যা খোদার দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কেননা এমন কর্মই ইমানের উন্নতির কারণ হয় আর হেদায়াতের উপর মানুষকে প্রতিষ্ঠিত রাখে। যেমন, খোদা তা'লা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ

(সূরা ইউনুস:১০)

অর্থ: 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্য কর্ম করেছে, তাদের প্রভূ তাদের ঈমানের কারণে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।'

অতএব যেখানে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ঈমানের সাথে সৎকর্ম সঠিক পথ প্রদর্শনের কারণ হয় সেক্ষেত্রে একজন মু'মিন

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا

দায়ার পাশাপাশি এর দ্বারা কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য, নিজের ঈমানের উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং প্রত্যেক বক্রতা থেকে বাঁচার দোয়াও করবে এবং নিজ কর্মকেও তদনুযায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। যদি আমরা রীতিমত ইবাদত করি এবং সৎকর্ম করার চেষ্টা অব্যাহত রাখি, জামাতের নেযাম এবং ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় রাখার চেষ্টা করি, ছোট-খাট জাগতিক কথাবার্তাকে ঈমানের উপর প্রাধান্য না দেই এবং জামাতের কোন কর্মীর সাথে ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের কারণে জামাতের নেযামকে যেন আমরা আক্রমনের লক্ষ্যে পরিণত না করি তাহলেই ঈমানের হিফাযত বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমরা যেসব দোয়া করি তা গৃহীত হবে।

অতএব যখন একব্যক্তি এই দোয়া করে তখন তাকে একান্ত সচেতনতার সাথে পথের হোঁচট থেকে বাঁচারও চেষ্টা করতে হবে। গভীর মনোযোগ সহকারে এই দোয়া করতে হবে। কারো দৃষ্টিতে, কোন সময় জামাতীভাবে যদি কারও বিরুদ্ধে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলে আপিল করার অধিকারের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে প্রপত্যকেই সে অধিকার চর্চা করতে পারে। সে অধিকার চর্চার পর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন কুধারণা না করে বিষয়টা খোদার হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। জাগতিক ক্ষয়ক্ষতিকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে তা মেনে নেয়ার চেষ্টা করা উচিত। নতুবা অভিযোগের বদঅভ্যাস হলে তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে মানুষকে জামাত থেকে দূরে নিয়ে যায়। খিলাফতের প্রতিও মানুষের হৃদয়ে কুধারণা সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে।

আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, প্রধানত: কখনও আমাদের হৃদয়ে জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে যেন কোন অভিযোগ দানা না বাধে এছাড়া আমাদের কর্ম খোদা তা'লার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। জামাতের ব্যবস্থাপনা আমাদের বিরুদ্ধে কখনও যেন অভিযোগ করতে না পারে। কোন সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে আমরা যেন পরীক্ষার সম্মুখীন না হই আর কখনও যেন এর এমন ফলাফল প্রকাশ না পায় যার ফলে আমাদের ঈমান নষ্ট হতে পারে বা জামাতের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফত সম্পর্কে আমাদের হৃদয়ে কুধারণা জন্ম নিতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার কৃপা এবং করুণা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই সবকিছু ঘটা সম্ভব

নয়।
হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর হাতে বয়'আত করার পর আমাদের ভ্রুক্ষেপহীন বা উদাসীন হওয়া উচিত নয় বরং পূর্বের তুলনায় আরো বেশি সচেতনতার সাথে খোদার রহমত বা করুণা সন্ধান করা উচিত। পবিত্র কুরআনে খোদা তা'লা যে বিভিন্ন বিগত নবী ও জাতি সমূহের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তার পিছনে উদ্দেশ্য হলো এরাও মনে করতো যে, আমরা ঈমান এনেছি তাই ভবিষ্যতে আর কোন হেদায়াতের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লা এ প্রেক্ষাপটে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের কথা উল্লেখ করেছেন কেননা পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত দিকনির্দেশনা গ্রহণ না করার কারণেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কুধারণা যদি হৃদয়ে দানা বাধে তাহলে নিজ সীমিত জ্ঞান ও ধারণার উপর নির্ভর করার কারণে মানুষের চিন্তাশক্তি সীমিত হয়ে যায়। আর এটিই ছিল তাদের বিকৃত হওয়ার কারণ। তাদের হৃদয় শুধু বক্রই হয়নি বরং খোদা তা'লা তাদেরকে الْمَغْضُوب এবং পথভ্রষ্টদের দলর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক নামাযের প্রতি রাকাতে আমাদেরকে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর পিছনে গভীর প্রজ্ঞা হলো, এদের অবস্থা দেখে শিক্ষা নাও আর সব সময় খোদার আশিস এবং কৃপা ভিক্ষা চাও। নিজেদের হৃদয়কে বক্র হওয়া থেকে রক্ষা কর। নতুবা যেভাবে তাদের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে এবং খোদার সাথে সম্পর্ককে তারা ভুলে গেছে, তোমরা যেন তেমন না হয়ে যাও। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: নামাযে দৈনিক পাঁচ বেলা এই দোয়া করা সত্বেও মুসলমানদের অধিকাংশ সে পথই অনুসরণ করছে যা মানুষকে খোদা থেকে দূরে নিয়ে যায় আর এর মূল কারণ হলো, হৃদয়ে কুধারণা পোষণ এবং স্বয়ং নিজেকে জ্ঞানী মনে করা।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, '**সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে এই দোয়া শিখিয়েছেন যে,**

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

(সূরা ফাতিহা, ৭-৮)

সর্বসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় **সহীহ্ হাদীস অনুসারে এটি প্রমাণিত যে,**

الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ

(মাগযুবি আলাইহিম) বলতে পাপাচারী বা দুরাচারী ইহুদীদের বুঝানো হয়েছে, যারা হযরত ঈসা (আ:)-কে কাফের আখ্যা দিয়েছে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অপমান করেছে ।তাদেরকে হযরত ঈসা (আ:) চরম অভিশাপ দিয়েছেন ও লা'নত করেছেন; একথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। আর الضَّالِّينَ (যাল্লিন) বলতে খৃষ্টানদের সেই পথভ্রষ্ট শ্রেণীকে বুঝায় যারা হযরত ঈসা (আ:)-কে খোদা জ্ঞান করেছে এবং ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। এরা মসীহ্র ক্রুশীয় মৃত্যুকেই নিজেদের মুক্তির কারণ মনে করে, এবং তাঁকে মহান খোদার আরশে বসিয়েছে। অতএব এ দোয়ার অর্থ হচ্ছে, হে খোদা! এমন ফযল ও কৃপা করো যাতে আমরা সেসব ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত না হই যারা মসীহ্কে কাফের আখ্যা দিয়ে তাঁকে হত্যা করার মত ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালিয়েছে এবং আমরা মসীহ্কে খোদা আখ্যা দিয়ে কোথাও ত্রিত্ববাদী না হয়ে যাই। যেহেতু খোদা তা'লা জানতেন যে, শেষ যুগে এই উম্মতের মধ্যে মসীহ্ মওউদ (আ:) আবির্ভূত হবেন আর ইহুদী প্রকৃতির কতক মুসলমান তাঁকে কাফের আখ্যা দিবে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করবে, তাঁকে চরমভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবমাননা করবে এবং আল্লাহ্ তা'লা এটিও জানতেন যে, সে যুগে ত্রিত্ববাদের ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করবে এবং অনেক দুর্ভাগা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। সে কারণেই তিনি মুসলমানদেরকে এই দোয়া শিখিয়েছেন এবং দোয়ার الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ বাক্যাংশ বলিষ্ঠ ভাবে ঘোষণা করছে যে, যারা মোহাম্মদী মসীহ্র বিরোধিতা করবে তারাও খোদা তা'লার পবিত্র দৃষ্টিতে সেভাবেই الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ যেভাবে ইসরাঈলী মসীহ্র বিরোধিরা الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ বা অভিশপ্ত ছিল।' (নূযুলুল মসীহ্-রূহানী খাযায়েন,১৮তম খন্ড-পৃষ্ঠা:৪১৯)

অতএব আমরা আহমদীরা সেই সৌভাগ্যবান লোকদের অন্তর্ভূক্ত যারা মুহাম্মদী মসীহ্কে মেনে الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ এ পরিণত না হওয়ার দোয়া কবুল হতে দেখেছে আর الضَّالِّينَ (যাল্লিন) হওয়া থেকে রক্ষা পাবার দোয়াও খোদা তা'লা আমাদের পক্ষে গ্রহণ করেছেন কেননা আমরা এক খোদার ইবাদতকারী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে চিরকাল এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। কিন্তু খোদা তা'লার এই যে নির্দেশ যে দোয়া কর যাতে হৃদয় কখনও বক্র না হয় এবং কখনও الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ এবং الضَّالِّينَ অর্থাৎ পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত না হই, এই দোয়া নিরবধি পাঠ করার নির্দেশ রয়েছে। তাই প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা এই দোয়া স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা অন্যান্য মুসলমানদের এই দোয়া বুঝার তৌফিক দিন যাতে উম্মতে মুসলিমা মহানবী (সা:)-এর নিষ্টাবান দাসের জামাতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ উম্মতের সত্যিকার চিত্র তুলে ধরে আর প্রত্যেক মুসলমান দাবীকারক মুহাম্মদী মসীহ্র বিরোধিতা পরিহার করে রসূল

করীম (সা:)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং আল্লাহ্‌র বাণীর সত্যায়ণকারী হয়। আর ছোট-খাট বিষয়ের পিছু লেগে থাকার পরিবর্তে এ দোয়ার প্রতিপাদ্য বিষয় যেন অনুধাবন করতে পারে। বিভিন্ন হাদীস থেকে এটি প্রমাণিত যে মহানবী (সা:)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

এর দোয়া অনেক বেশি পাঠ করতেন। যা হযরত সাহার বিন হাউশেব কর্তৃক বর্ণিত যে, আমি হযরত উম্মে সালমা (রা:)-কে জিজ্ঞেস করেছি, হে উম্মুল মু'মিনীন! মহানবী (সা:) যখন আপনার ঘরে থাকতেন তখন কোন দোয়া পাঠ করতেন? তিনি বলেন, মহানবী (সা:) এই দোয়া পাঠ করতেন যে, **ইয়া মুকাল্লেবাল কুলুবী সাব্বিত ক্বালবী আলা দ্বীনেকা** অর্থ: **'হে হৃদয়সমূহের নিয়ন্তা! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার ধর্মের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করো।' হযরত উম্মে সালমা (রা:) বলেন, আমি মহানবী (সা:)-কে যথারীতি এই দোয়া পাঠ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি (সা:) বলেন, হে উম্মে সালমা! মানুষের হৃদয় খোদার দু'আঙ্গুলের মাঝে রয়েছে (অর্থাৎ খোদার নিয়ন্ত্রণে) যাকে তিনি ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান রাখেন আর যাকে না চান তার হৃদয়কে বক্র হতে দেন।' (সুনান তিরমিযী)**

অতএব দেখুন! কত সাবধানতার প্রয়োজন। আর আমাদের নিজ হৃদয়কে বক্রতামুক্ত রাখার জন্য কত বেশী দোয়া করা দরকার; কেননা কুধারণা ও ছোট-খাট অভিযোগ অনেক সময় মানুষকে এত দূরে নিয়ে যায় যে, মানুষ ধর্মচ্যুত হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ্‌! আঁ হযরত (সা:)-এর হৃদয় কি বক্র হওয়া সম্ভব ছিলো? নিশ্চয় নয়, কখনও হতে পারে না। তাঁর হৃদয়ে সদা খোদার সত্ত্বাই বিরাজ করতো। তাঁর মাধ্যমে খোদা তা'লা এই ঘোষণা করিয়েছেন যে,

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

(সূরা আল্‌ ইমরান:৩১)

অর্থ: '(যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ভালবাসা চাও) তাহলে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তিনি তোমাদের সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন।' অতএব তার হৃদয় বক্র হওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। তাঁর আনুগত্য পাপ থেকে মুক্তির কারণ হয়। তাঁর উঠা-বসা ও চলা-ফিরা এবং জীবন-মৃত্যু সবই খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে ছিল। তিনি (সা:) একবার বলেছেন যে, **'নিদ্রাকালে আমার চোখ ঘুমালেও আমার হৃদয় খোদার স্মরণে ব্যাপৃত থাকে।'**

অতএব মহানবী (সা:) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে দোয়া করতেন। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দোয়া করেছিলেন যেন উম্মতের হৃদয় বক্র না হয় আর মসীহ্‌ ও মাহদী আবির্ভূত হলে তাঁকে গ্রহণ করে। হায়! মুসলমানরা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বুঝত! একবার সত্যকে বুঝার পর, যারা সত্য গ্রহণ করেছেন এবং এর খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের বংশোদ্ভুত হওয়ার পরও যদি মানুষ এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়; আল্লাহ্‌র কৃপা লাভ করা এবং তাত্থেকে অংশ পাবার পরও খোদার ক্রোধভাজন হওয়ার তুলনায় বড় পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে? মুসলমানদের একটু ভাবা ও চিন্তা করা উচিত। বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা কি এ সমস্ত বিষয়ের পরিচায়ক নয় যে, তারা খোদার ক্রোধের শিকার হচ্ছে? খোদা তা'লা তাদের প্রতি করুণা করুন। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে হযরত ইব্রাহীম (আ:) হযরত ইসমাঈল (আ:) এবং মহানবী (সা:)-এর দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ যে মসীহ্‌ মওউদ এসেছেন তাঁকে মুসলমানরা এ অজুহাতে অস্বীকার করছে যে, এখন আমাদের কোন হেদায়াতদাতার প্রয়োজন নেই। উম্মতে মুসলিমা মসীহ্‌ মওউদ (আ:)-কে মানলে বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান যুগের নামসর্বস্ব আলেমদের স্বার্থহানী ঘটে কেননা, এতে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। অথচ অজুহাত হলো, রসূল করীম (সা:)-এর পর অন্য কোন নবী বা সংস্কারক আসতে পারে না কেননা এতে তার খত্‌মে নবুওয়তের উপর আঘাত আসে।

আবার বলে যে, আমাদের হাতে পবিত্র কুরআন রয়েছে তাই কোন মসীহ্‌-মাহদী বা সংস্কারকের প্রয়োজন নেই। আমি পূর্বেও এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। তারা খিলাফতের আবশ্যকতা অস্বীকার করে না কিন্তু অজ্ঞরা বুঝে না যে, মসীহ্‌ মওউদকে বাদ দিয়ে খিলাফতের কোন ধারণাই করা যায় না। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকে মসীহ্‌ মওউদের আগমনই মহানবী (সা:)-এর খাতামান্নাবীঈন হবার প্রমাণ। কিন্তু এরা কুরআন বোঝে বলে দাবী করলেও এই বিষয়গুলো বুঝে না আর এদের জন্য বুঝা সম্ভবও নয়। আমাদের কাছে কুরআন আছে তাই কোন হেদায়াতদাতার প্রয়োজন নেই, এই হলো তাদের জ্ঞানের বহর। পবিত্র কুরআন তাদের জন্যই বোধগম্য বা তাদের জন্য এর শিক্ষা সুস্পষ্ট হয় যারা খোদা তা'লা কর্তৃক মনোনীত। আর এই যুগে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ:)-ই খোদার সেই মনোনীত পুরুষ যিনি কুরআনের রহস্যাবলী আমাদের সামনে উম্মোচন করেছেন। আর সেই সমস্ত উপায় চিহ্নিত করেছেন যদ্দারা কুরআনের জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'ধর্মীয় জ্ঞান এবং সত্যিকার মা'রেফত বুঝা এবং অর্জনের জন্য প্রথমে পবিত্র হওয়া ও অপবিত্র পথ পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। সে কারণেই খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,**

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

(সূরা আল্ ওয়াকে'আ:৮০)

অর্থাৎ খোদার পবিত্র কিতাবের রহস্যাবলী তারাই বুঝে যাদের হৃদয় পবিত্র এবং যাদের আমল পবিত্র। পার্থিব চাতুর্য বা শঠতার মাধ্যমে কখনও ঐশী জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।'(সত বচন রূহানী খাযায়েন, ১০ম খন্ড-পৃঃ ১২৬)

তিনি আরো বলেন যে, **'কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান কেবল তাদের সম্মুখেই উন্মুক্ত করা হয় যাদেরকে খোদা তা'লা স্বয়ং নিজ হাতে পূত-পবিত্র করেন।' (বারাহীনে আহমদীয়া-রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড-পৃ:৬১২-টীকা-পাদটীকা: নাম্বার:৩)**

তিনি (আ:) অন্যত্র বলেন, **'এরা বলে যে, মসীহ্ এবং মাহদীর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই বরং কুরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আমরা সরল-সুদৃঢ় পথে আছি। অথচ এরা জানে যে, কুরআন এমন এক গ্রন্থ যা পবিত্রচেতা মানুষ ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না, সেজন্য এমন একজন তফসীরকারকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যাকে খোদা তা'লা পবিত্র করেছেন এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেছেন।' (সূরা আল্ ওয়াকে'আ: ৮০ নাম্বার আয়াতের আলোকে কৃত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর তফসীর, ৪র্থ খন্ড-পৃ:৩০৮)**

অতএব এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কেই খোদা তা'লা নিজ হাতে পূত-পবিত্র করেছেন এবং কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন। তাই এরা যত চেষ্টাই করুক না কেন মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কখনও কুরআনের রহস্য উদঘাটন করতে পারবে না। যতই দোয়া করুক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে মানার জন্য কার্যত: কোন উদ্যোগ না নেবে এদের হৃদয় বক্রই থাকবে।

সুতরাং যেখানে এদের অবস্থা দেখে আহমদী হবার কারণে, খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত সেখানে সকল প্রকার বক্রতা থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা দোয়াও করা উচিত। বিশ্ববাসী যেভাবে বস্তুবাদীতার দিকে ছুটছে এবং খোদা তা'লাকে ভুলে বসছে, এহেন পরিস্থিতিতে এই দোয়া পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী করা উচিত যে, এই নিয়ামতের কল্যাণ থেকে যেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কখনও বঞ্চিত না করেন। তিনি আমাদের দৃঢ়চিত্ততা দান করুন আর নিজ অনুগ্রহে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করুন। রহমত লাভের দোয়াও আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে শিখিয়েছেন। খোদার রহমত, দয়া এবং করুণা কেবল তারাই লাভ করে যারা খোদার ইবাদত করে এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'কুরআন করীমে এক স্থানে বলা হয়েছে যে,** وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

(সূরা আল্ আহযাব:৪৪)

অর্থাৎ খোদার রহীমিয়্যত, **দয়া কেবল বিশ্বাসীদের জন্যই নির্ধারিত। কাফির, বেঈমান এবং বিদ্রোহী এথেকে অংশ পেতে পারে না।'** তিনি আরো বলেন, **'বিশেষ রহমত যা মু'মিনদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা পবিত্র কুরআনের সর্বত্র রহীমিয়্যতের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,**

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

(সূরা আল্ আ'রাফ:৫৭)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(সূরা আল্ বাকারা:২১৯)

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে জন্মভূমি থেকে হিজরত বা কুপ্রবৃত্তির পূজা পরিত্যাগ করে এবং জিহাদ করে, এরাই আল্লাহ্‌র রহমতের আশা রাখতে পারে। বস্তুত: আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। অর্থাৎ তাঁর রহীমিয়্যতের এই কল্যাণধারা থেকে কেবল তারাই অংশ লাভ করে যারা যোগ্য। এমন কেউ নেই যে খোদাকে সন্ধান করেছে অথচ পায় নি।' (বারাহীনে আহমদীয়া-রূহানী খাযায়েন, ১ম খন্ড-পৃ:৪৫১-৪৫২-এর টীকা-পাদটীকা: নাম্বার:১১)

সুতরাং এখানে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রহমত খোদার পক্ষ থেকে আসে আর কেবল তারাই লাভ করে যারা সৎকর্মশীলতা এবং ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতির আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। মুহসেনীন কারা? তারাই মুহসেনীন যারা সৎকর্ম করেন। অতএব খোদার দয়া লাভের জন্য দোয়ার পাশাপাশি সকল প্রকার বক্রতা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। শুধু বক্রতা থেকে বাঁচার চেষ্টাই নয় বরং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যারা সৎকর্ম করার চেষ্টা করে কেবল তারাই মুহসেন বা মুহসেনীন। তারা শুধু সাধারণ সৎকমই করে না বরং নেক কর্মের ক্ষেত্রে

উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। মহানবী (সা:)-এর একটি উক্তি মোতাবেক তারা এই চিন্তা ও চেতনা নিয়ে প্রতিটি কাজ করে যে, আমাদের উপর সদা খোদার দৃষ্টি রয়েছে আর মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর উক্তি অনুসারে তারা কুপ্রবৃত্তির পূজাকে এড়িয়ে চলে, এথেকে নিজেকে দূরে রাখে আর সৎকর্ম দ্বারা খোদার সন্তুষ্টি সন্ধান করে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন নিজ ইবাদত এবং কর্মের হিফাযতের মাধ্যমে, খোদার সামনে সদা বিনত থেকে এবং সর্বদা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে বিরত থেকে, খোদার সাহায্যে সকল প্রকার বক্রতা থেকে যেন মুক্ত থাকি যাতে খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমাদের প্রতি যেসব নিয়ামত বর্ষণ করেছেন তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারি এবং আর আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতি নিয়ামতের ধারা যেন ক্রমশ: প্রবল রূপ ধারণ করে।

দ্বিতীয়ত: সফরের প্রেক্ষাপটে আমি একটি দোয়ার অনুরোধ করতে চাই, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমার সফর আরম্ভ হতে যাচ্ছে। মানুষ জানে যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আমি কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে সফরে বের হচ্ছি। কাদিয়ানের জলসা হবে, সেই জলসার জন্য দোয়া করুন যেন তা সকল অর্থে সফল ও বরকতময় হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল অনিষ্ট এবং দুষ্কৃতি থেকে প্রত্যেক আহমদীকে নিরাপদ রাখুন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ সেখানে যাচ্ছেন। আভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে ব্যাপকহারে ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের কিছু সমস্যা আছে তাই ভিসা লাভের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। যাই হোক, অনেকেই পেয়েছেন এবং অনেকে যাবার চেষ্টা করছেন। ভারত সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করুন। যারা একান্ত সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও এসব বাঁধা-বিপত্তির কারণে যেতে পারছেন না খোদা তা'লা তাদের নেক নিয়্যতের প্রতিদান দিন। যারা যাচ্ছেন এবং যারা যেতে পারছেন না সবাই অনবরত দোয়ায় রত থাকুন যেন খোদা তা'লা হিংসুক ও দুস্কৃতিকারীদের সকল অপকর্ম থেকে নিরাপদ রাখেন কেননা, এদের কুদৃষ্টি সব সময় জামাতের উপর লেগেই আছে। আর কাদিয়ানবাসীদেরও আল্লাহ্ তা'লা সর্বপ্রকার দুষ্কৃতি থেকে নিরাপদ রাখুন।

কাদিয়ান ছাড়াও ভারতের দুর-দূরান্তের বিভিন্ন জামাত যারা কাদিয়ান আসতে পারেন না তাদের আকাঙ্খা ছিল আমি যেন সেখানে যাই। ভারত একটি বিশাল দেশ, গরীব মানুষ তাই অনেকের কাদিয়ান আসার সামর্থ নেই। এই দৃষ্টিকোন থেকে ইনশাআল্লাহ্ কাদিয়ানের বাইরে অন্যান্য শহরে যাবারও পরিকল্পনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সেসব জায়গার অনুষ্ঠানাদীও সকল অর্থে সফল করুন। আর আমার এই সফর সার্বিক দৃষ্টিকোন থেকে অগণিত কল্যাণের ধারক ও বাহক হোক। আর শত্রুর সকল ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি ব্যর্থ ও নিস্ফল হোক আর আমরা যেন সবসময় জামাতের উন্নতি দেখতে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রাখুন আর আমরা কখনই যেন তার ফযল এবং অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হই।

জুমুআর নামাযের পর আমি দু'টো গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো। প্রথম জানাযা হলো, আমাদের দরবেশ ভাই মোকার্‌রম বশীর আহমদ সাহেবের যিনি কাদিয়ানে দরবেশের জীবন কাটিয়েছেন। গত ১৩ই নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেছেন,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তিনি কাদিয়ানের প্রাথমিক যুগের দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে সারাটা জীবন দরবেশীর মাঝে অতিবাহিত করেছেন। যদিও দু'তিন বার তার সুযোগ এসেছে, সেখান থেকে তিনি পাকিস্তান যেতে পারতেন। সেখানে তার আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, না আমি কাদিয়ানেই থাকবো। আমার জীবন মৃত্যু আর আমার কবর সবকিছু এখানেই হবে। অত্যন্ত পুণ্যবান, সহজ-সরল, তাহাজ্জুদ গুজার, দোয়াগো এবং নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। প্রতিটি তাহরীকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সাড়া দিতেন। মরহুম পাঁচ মেয়ে এবং এক ছেলে রেখে গেছেন এবং মুসী ছিলেন। সেখানেই দরবেশদের জন্য নির্ধারিত বিশেষ স্থানে সমাহিত হয়েছেন। খোদা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং সদা তার উপর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা মোকার্‌রম গযন্‌ফার চাট্‌ঠা সাহেবের। তিনি নাজারাত বায়তুল মালের পক্ষ থেকে বুরেওয়াল-এ ইন্সপেক্টর বাইতুল মাল ছিলেন। ১৮ই নভেম্বর তিনি ভেহাড়ী জেলায় সফর করেছিলেন। আমীর সাহেবের বাসস্থানের কাছেই দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় মোটর সাইকেল আরোহী তাঁর ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। হাতাহাতির এক পর্যায়ে তারা তার উপর গুলি করলে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৬ বছর। তার সম্পর্কও ভেহাড়ীর সাথেই ছিল। এ দৃষ্টিকোন থেকে আমি এটিকে জামাতী শাহাদত মনে করি। আমার মনে হয় তার ব্যাগে জামাতি কাগজপত্র ছিল আর হয়তো কিছু টাকাও ছিল। এদিক থেকে তার শাহাদত জামাতী শাহাদত গণ্য হতে পারে। এটি নিছক ডাকাতির ঘটনা নয়। আল্লাহ্ তা'লা তার রুহের মাগফিরাত করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

পবিত্র কুরআনের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম 'কাফী' সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা

দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন অসহায় মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং বর্বর আক্রমনের কারণে যালেম ইসরাইলকে শাস্তি প্রদান করেন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

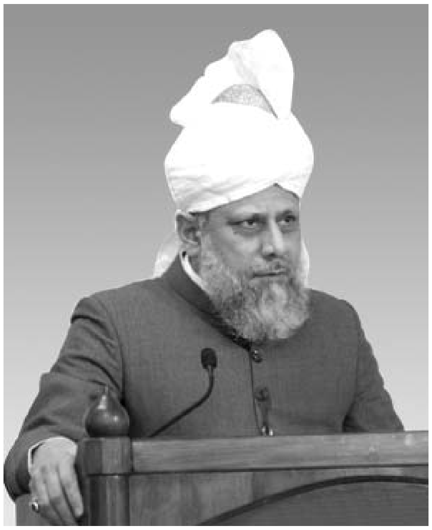

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই:) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৬ই জানুয়ারী ২০০৯-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ:-

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই:) বলেন, যে মু'মিন খোদা তা'লার সিফাত বা ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত তিনি এটি ভাল করেই জানেন যে, আল্লাহ্ তা'লার একটি গুণবাচক নাম বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'কাফী' (যথেষ্ট)। ঐশী গুণাবলীর জ্ঞান না থাকলেও অনেকেই এমন আছেন যারা পরিবেশ বা সমাজের প্রভাবে খোদার গুণবাচক নামের বরাতে কথা বলে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লার কাফী বৈশিষ্ট্য এমন একটি বৈশিষ্ট্য একজন মুসলমান কখনও না কখনও কোন না কোন বরাতে তার উল্লেখ করেই থাকে। অনেক সময় স্বল্পেতুষ্ট বা কৃতজ্ঞ না হলেও বারবার শোনার কারণে মানুষ কথার কথা হলেও এবাক্য বলে থাকে যে, আল্লাহ্ কাফী বা আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু একজন মু'মিন যখন খোদার গুণাবলী সম্পর্কে কথা বলেন তখন তিনি হৃদয়ের গভীর থেকেই তা বলেন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অগণিত স্থানে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আরবী অভিধানে এই শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। অভিধান গ্রন্থ 'লেইন' থেকে আমি কাফী শব্দের কয়েকটি অর্থ উপস্থাপন করছি। 'কাফা' কোন জিনিষ যথেষ্ট হওয়া, কোন জিনিষ বা কোন কিছুতে তুষ্ট হওয়া, কারো উপর নির্ভর করা বা প্রশান্তি বোধ করা। প্রকৃত অর্থে খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কেউ মানুষের আত্মার প্রশান্তির কারণ হতে পারে না। 'কাফা ইয়াক্ফী কিফায়াতান' এর অর্থ হচ্ছে, যখন কোন মানুষ কোন কাজের জন্য দন্ডায়মান হয়। 'কাফানী ফুলানুন আল্ আমরা' এর অর্থ হচ্ছে, 'কোন বিশেষ বিষয়ে অমুক ব্যক্তির উপর আমি নির্ভর করেছি অথবা বা তার উপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। অর্থাৎ যদি ভালো কিছু হয় তা তার মাধ্যমে লাভ করেছি এবং যদি কোন অশুভ বিষয় থাকে তাহলে তার মাধ্যমে আমি তা থেকে রক্ষা পেয়েছি।' অভিধান গ্রন্থে আরেকটি অর্থ করা হয়েছে, 'কাফা মিনহু' অর্থ হচ্ছে, 'কোন জিনিষ কারো থেকে দূর করে এর অনিষ্ট থেকে তাকে বাঁচানো বা নিরাপদ রাখা।' আবার যখন বলা হবে যে, 'কাফাহু আল্ শার্‌রা' তখন এর অর্থ হবে, 'সে মন্দকে দূরীভূত

করে তার নিরাপত্তা বিধান করেছে এবং তাকে মুক্ত করেছে। এটি খোদা এবং বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।' যখন বলা হয় যে, 'কাফাকা হাযাল আমরু' তখন এর অর্থ হবে, 'তোমার জন্য এই কর্ম যথেষ্ট।'

একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي أغنتاه عن قيام الليل

অর্থ: 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করবে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। অর্থাৎ, সেই দু'টি আয়াত তাকে রাতের বেলা দন্ডায়মান হবার কারণে তাকে পরবিমুখ করবে।' অনেকে এর অর্থ করেছেন, রাতের বেলা তাহাজ্জুদের সময় যদি অন্তত পক্ষে এ দু'টো আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তা হলে সংখ্যার দিক থেকে তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে অনেকে এর অর্থ করেছেন, এই দুটো আয়াত অনিষ্টের মোকাবিলায় যথেষ্ট এবং এ দু'টি আয়াত সৃষ্টির অনিষ্টের মোকাবেলায় মানুষের জন্য রক্ষা কবচ।

এ আয়াত দু'টির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে যে, এতে অনেক মূল্যবান বিষয়ের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এতে দোয়ার পাশাপাশি ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষা পাবার রীতি-নীতি আর ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা লাভের উপায় শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে হাদীস অনুসারে মনে হয় যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করাই যথেষ্ট হবে কিন্তু বিষয় এমন নয়। আমি এখন এই দু'টি আয়াতের সূত্র ধরে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করবো:-

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٦﴾

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٧﴾

(সূরা আল্ বাকারা: ২৮৬-২৮৭)

অর্থ: 'এই রসূল স্বয়ং তার উপর ঈমান রাখে যা তার প্রতি তার প্রভুর পক্ষ হতে নাযেল করা হয়েছে এবং অপরাপর মু'মিনগণও; তারা সবাই আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশ্‌তা, কিতাবসমূহ, এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান রাখে; এবং তারা বলে, আমরা রসূলদের কারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। এবং তারা বলে, আমরা শ্রবণ করলাম এবং আনুগত্য করলাম; হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন।' 'আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। সে যা ভাল উপার্জন করবে তা তার জন্যই কল্যাণকর হবে এবং যা মন্দ উপার্জন করবে তা তারই বিপক্ষে যাবে। হে আমাদের প্রভু! যদি আমরা ভুলে যাই বা ত্রুটি-বিচ্যুতি করি, তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না; হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করো না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; তুমি আমাদেরকে মার্জনা করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি রহম করো, কারণ তুমিই আমাদের অভিভাবক, অতএব কাফির জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো।'

হুযূর বলেন, এ আয়াতের অর্থ শুনে নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন যে, কেন মহানবী (সা:) রাতের বেলা এ আয়াত দু'টি পাঠ করাকে যথেষ্ট বলেছেন। প্রথম আয়াতে আত্মশুদ্ধির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। ফিরিশ্‌তা ও রসূলদের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। কেবল মৌখিকভাবে পাঠ করাই যথেষ্ট নয় এর মর্মার্থ অনুধাবন করে ব্যবহারিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটানো আবশ্যক। সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান তখনই দৃঢ় হয় যখন তোমরা ত্বাকওয়া বা খোদা ভীতিতে ক্রমোন্নতি করতে থাকবে। খোদার ফিরিশ্‌তাদের প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো: এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তাদের কাজ থেমে যায়নি বরং নিরন্তর তারা কাজ করে যাচ্ছেন। অনুরূপভাবে পূববর্তী নবীদের প্রতি যেসব ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তা খোদার পক্ষ থেকে ছিল; কালের প্রবাহে তা বিকৃতির শিকার হলেও খোদা তা'লা এর মূল শিক্ষামালাকে পবিত্র কুরআনে সংরক্ষণ করেছেন আর এভাবে অতীত ঐশী গ্রন্থের সত্যায়ন হয়েছে। খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত সব ধরনের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন থেকে মুক্ত রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। এ

আয়াতের আরেকটি দিক হলো, সকল নবীদের উপর বিশ্বাস রাখার নির্দেশ। এটি ইসলামেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য অন্য কোন ধর্মে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। এখানে একথা বলা হয়নি যে, অতীতের সকল নবীদের প্রতি ঈমান রাখো বরং বলা হয়েছে সকল নবীর উপর ঈমান আনো, অর্থাৎ ভবিষ্যতে আগমনকারীর উপরও ঈমান আনো। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা:) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর আগমনের পথ উম্মোচন করে ভবিষ্যতে আগমনকারী রসূলদের মান্য করা এবং তাদের প্রতি ঈমান আনারও সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান যুগের নামধারী মোল্লাদের দুর্ভাগ্য যে, তারা আল্লাহ্র সুন্নত বা রীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে সেভাবে মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর আগমন প্রতীক্ষায় রত যা খোদার নিয়ম বিরোধী। পবিত্র কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখার দাবী করা সত্ত্বেও তারা কুরআনের শিক্ষা বিরুদ্ধ কাজ করছে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ:) মৃত্যুবরণ করেছেন আর যে কেউ এ ধরায় জন্ম নিবে সে কোনভাবেই শুধু এই জড়দেহের উপর ভর করে আকাশে যেতে পারবে না বরং তার রূহ বা আত্মা আকাশে যাবে। এ পৃথিবীতে যে জন্ম নিবে তাকে অবশ্যই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করতে হবে কেননা সবকিছুই লয়শীল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে অস্বীকার করে এরা নিজেদের সব রসূলের প্রতি ঈমান আনার দাবীও মিথ্যা প্রমাণ করছে। আর সাধারণ মুসলমানকে নিজেদের মনগড়া বিশ্বাস দ্বারা প্রতারিত করছে। এদের কিছুটা হলেও বিবেক খাটানো উচিৎ কেননা এরা কুরআন এবং হাদীস পাঠ করে; তাদের জানা আবশ্যক যে, অন্যান্য নবী রসূলগণ যেভাবে এসেছেন সেভাবেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) আবির্ভূত হবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) খোদার পক্ষ থেকে আবির্ভূত হবার দাবী করেছেন এবং নিজের সত্যতার স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণও দিয়েছেন আর খোদার পক্ষ থেকে ব্যবহারিক সমর্থনও তাঁর সত্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখন এদের উচিত বিবেক খাটানো এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর জামাতভূক্ত হওয়া। সেই দলে এদের যোগ দেয়া উচিত যারা বলে, সামি'না ও আত্বা'না আর এই কর্মই গুফরানাকা রব্বানা'র দোয়া গৃহীত হওয়ার কারণ হবে। অর্থাৎ হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সুতরাং আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তনের ফলে এই জান্নাত লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে এই বাস্তবতা অনুধাবন করার তৌফিক দিন। আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারার শেষ আয়াতটি

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

বাক্য দিয়ে আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ খোদা যা বলেছেন তা মানুষের সাধ্যের ভেতর রয়েছে, তিনি কোন সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না। অনেকেই বলে, খোদার অমুক নির্দেশ পালন করা খুবই কষ্টসাধ্য অথচ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মানুষের উপর কোন সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না। এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, 'আমাদের জন্য নির্দেশ হলো, সকল নৈতিক গুণাবলী এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে মহানবী (সা:)-এর অনুসরণ করা। অতএব আমাদের প্রকৃতি এবং বৃত্তি'তে যদি রসূলে করীম (সা:)-এর সকল আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠাকে অবলম্বন করার শক্তি না রাখা হতো তাহলে কখনই তাঁকে অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হতো না। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষের উপর সাধ্যাতীত কোন দায়িত্বভার অর্পণ করেন না। তিনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

এরপর হুযূর আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আহমদীদেরকে বুঝে-শুনে এ আয়াত দু'টি পাঠ করার উদাত্ত আহবান জানান। প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ঈমান দৃঢ় বা মজবুত করার নির্দেশ দিয়েছেন। খোদার প্রতিটি নির্দেশ আমাদেরকে শিরোধার্য করতে হবে। আমরা খোদার কিছু কথা মানবো আর কিছু মানবো না! এমনটি হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মহানবী (সা:)-এর আদর্শ। তোমরা তাঁর আদর্শের অনুসরণ করো। খোদা তা'লা তাঁর বান্দার প্রতি বড়ই মমতাশীল তাই তাঁর সকল নির্দেশ মান্য করা মানুষের সাধ্য ও সামর্থের অন্তর্গত।

হুযুর বলেন, সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করলে ধর্মীয় দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না বরং আমল ও অনুশীলন আবশ্যক। এ আয়াত দু'টি পাঠের কল্যাণে মানুষ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করে; সে রাতের বেলা স্বীয় মুক্তির জন্য দন্ডায়মান হয়। রাতের প্রিয় ঘুম হারাম করে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে। শুধু আল্লাহ্ তা'লার করুণার ফলেই এ আয়াত দু'টি মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে আর শুধু তখনই ইবাদত এবং সৎকর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। নতুবা যদি কেউ এ কথা মনে করে যে, এ আয়াত দু'টি পাঠ করাই যথেষ্ট, তাদের ধারণা ভুল কেননা আল্লাহ্ বলেন,

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থ: সে যা ভাল কাজ করবে তা তার জন্যই কল্যাণকর এবং যা মন্দ উপার্জন করবে তা তারই বিপক্ষে যাবে।

এখেকে বুঝা যায় যে, এই আয়াতগুলো কেবল মৌখিকভাবে আওড়ানো যথেষ্ট নয় বরং নিজেদের ইবাদত এবং সৎকর্মের প্রতি সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে; তাহলেই বান্দা খোদার নৈকট্য ও ক্ষমা লাভ করবে। প্রত্যহ এ আয়াত পাঠ করলে পুণ্যকর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে এবং আত্মবিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবে। একজন মু'মিন যেহেতু জানে যে, সে তার প্রবৃত্তি দ্বারা প্রতারিত হতে পারে তাই সে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দোয়া করে, হে আমাদের খোদা! যদি আমি প্রতারিত হই তাহলে নিজ করুণায় আমাকে ক্ষমা করো। আয়াতের বাক্যাবলী মু'মিনকে খোদার সামনে অবনত করে আর আত্মশুদ্ধির জন্য এ বাক্যাবলী একান্ত আবশ্যক। নিষ্ঠা এবং একান্ত আন্তরিকতার সাথে যদি কেউ এ দোয়া করে তাহলে তার দোয়া খোদার দরবারে গৃহীত হবে। শেষ আয়াতে আল্লাহ্ প্রথম যে দোয়া শিখিয়েছেন তাহলো,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِنْ نَّسِيْنَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

অর্থ: 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা ভুলে যাই বা ত্রুটি-বিচ্যুতি করি।' অর্থাৎ হে খোদা! আমরা তোমার নির্দেশ পালন করার চেষ্টা করবো, আদেশ নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করবো। মানুষের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করবো। মানবিক দুর্বলতা এবং আলস্যহেতু যদি আমাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে যায়, সৎকর্মের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি আমাদেরকে পদস্খলিত করে তাহলে তুমি আমাদেরকে ধৃত না করে কৃপা ও একান্ত করুণাবশত: নিজ সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করো। এরপর দ্বিতীয় দোয়া শিখানো হয়েছে:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন দায়িত্বভার অর্পণ করো না যেরূপ দায়িত্বভার তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলে। অর্থাৎ, হে খোদা! আমাদের কোন কর্ম যেন তোমার সন্তুষ্টি বহির্ভূত না হয়। আমরা যেন সর্বদা তোমার নির্দেশ মোতাবেক চলতে পারি। পূর্ববতীদের মত আমারা যেন ধৃষ্ট না হই। তারা তোমার নির্দেশকে অবজ্ঞার মত অপরাধ করেছে; তাই সকল কাজে সফলতা লাভের জন্য আমরা তোমার সাহায্যের মুখাপেক্ষী। এমন কোন সময় যেন না আসে যখন আমাদের কর্মফল তোমা থেকে আমাদেরকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। কোনভাবেই আমরা যেন তোমার নির্দেশকে অবজ্ঞা না করি। এটি জানা কথা যে, খোদা কখনও মানুষের উপর এমন বোঝা চাপান না যা মানুষের জন্য অসাধ্য। সতিকার অর্থে মানুষ নিজের দুর্বলতার কারণেই ব্যর্থ হয়, তাই আমাদেরকে দোয়া করতে হবে যে, হে আমাদের খোদা! আমরা যেন তোমার সাথে কৃত আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ না করি, যেভাবে পূর্ববর্তীরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তোমার শাস্তি পেয়েছে। إِصْر (ইছর) শব্দের একটি অর্থ হলো অঙ্গীকার বা চুক্তি ,সেই দৃষ্টিকোন থেকেই আমি এ কথা বললাম। দোয়াটি হলো, হে খোদা! পূর্ববর্তীরা তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা না করে শাস্তি পেয়েছে আমরা যেন এমন না হই। এরপরে দোয়া শিখানো হয়েছে:

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।'

অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা মানুষের কাছ থেকে জাগতিক পরীক্ষা নেন। কোন পরীক্ষা বা সমস্যা দেখা দিলে বা অনাকাংখিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মু'মিন সর্বদা এ দোয়াতেই রত হয় যে, হে খোদা! তুমি আমাদেরকে এর ক্ষতি থেকে রক্ষা করো। কোন পরীক্ষা যেন আমাদের জন্য সাধ্যাতীত না হয়। আমরা আমাদের দু:খের দিনে তোমাকে যেভাবে স্মরণ করি সেভাবেই সুখের দিনেও যেন তুমিই আমাদের ধ্যান ও জ্ঞানে থাক। আমরা যেন কোন অবস্থাতেই তোমাকে বিস্তৃত না হই। আধ্যাত্মিক পরীক্ষার পাশাপাশি জাগতিক পরীক্ষা থেকেও বাঁচার জন্যও মু'মিনকে বেশি বেশি দোয়া করা উচিত কেননা জাগতিক পরীক্ষা অনেক সময় আধ্যাত্মিক পরীক্ষার কারণ হয়। খোদা তা'লা অনেক সময় সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের মাধ্যমেও পরীক্ষা নেন। আর এই উভয় প্রকার পরীক্ষা থেকে উত্তরণের জন্যও খোদা তা'লাই দোয়া শিখিয়েছেন, وَاعْفُ عَنَّا অর্থাৎ, আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কোন ভুলের জন্য যদি পরীক্ষা এসে থাকে তাহলে তা তুমি অপসারণ করো।

এরপর দোয়া শিখিয়েছেন, وَاغْفِرْ لَنَا আমাদেরকে ক্ষমা কর আর আমাদের অবস্থা শুধরে দাও। 'গাফারা' শব্দের একটি অর্থ হলো, 'ঢাকা' অপরটি হলো, বিষয়কে সঠিক খাতে পরিচালিত করা। আমাদের ভুল-ত্রুটি, দুর্বলতা দূর করে ভবিষ্যতে এমন কর্ম সম্পাদনের তৌফিক দাও যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ

হবে। وَارْحَمْنَا ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ভুল থেকে বাঁচার তৌফিক দাও আর এমন কাজ করার সৌভাগ্য দাও যা তোমার স্নেহের দৃষ্টি লাভে সহায়ক হবে। আমাদের কর্মের কারণে যেন তোমার দয়া স্তিমিত না হয়। اَنْتَ مَوْلٰنَا অর্থাৎ খোদার পবিত্র সত্ত্বাই পারে ক্ষমা ও করুণা করতে।

হুযূর বলেন, এক ব্যক্তির অন্যায় আচরণের কারণে মানুষ জামা'তকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখে, আবার অনেক সময় সামগ্রিকভাবেও দুর্বলতা প্রকাশ পায় আর জামাতের কর্মকর্তারা মানবীয় দুর্বলতা বশতঃ ভুল করে বসে। এ বিষয়ের প্রতি সদা যত্নবান থাকা চাই কেননা আপনার ভুল যেন অন্যকে জামা'তের বিরুদ্ধে আঙ্গুল উঠানোর সুযোগ না দেয়। আমাদের ব্যক্তিগত ভুলের কারণে বিরুদ্ধবাদীরা যেন বলতে না পারে যে, মন্দকর্মের কারণে তোমরা ধৃত হচ্ছো। যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে বেশি বেশি দোয়া করা উচিত যে, হে খোদা! তোমার জামা'তের পয়গাম পৌঁছানোর কাজ বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে। এই দোয়াও করা উচিত, হে খোদা! আমাদের হৃদয়কে কঠোর হতে দিও না আর আমাদেরকে সরল-সোজা পথে পরিচালিত করো এবং আমাদের সংশোধন কর

فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অতএব কাফির জাতির বিরুদ্ধে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো কেননা আমরা দুর্বল এবং অসহায় তোমার কৃপা ও করুণার ফলেই বিজয় বা সফলতা আসবে। নিজ করুণায় আমাদেরকে তোমার প্রিয়দের অন্তর্ভূক্ত রাখ। নিজ অনুগ্রহে আমাদের এবং কাফির জাতির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করো। যেন আমাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় তোমা দ্বারা সম্পাদিত হয়। তোমার মসীহ্‌কে মানা যেন আমাদের জন্য সার্থক হয়। এই চেতনা নিয়ে উপরোক্ত দু'টি আয়াত পাঠ করলে আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য সঠিক থাকবে নচেৎ কেবল বুলি সর্বস্ব

বর্তমানে ইসরাইল নিরীহ এবং নিস্পাপ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর অত্যন্ত বর্বর এবং নৃশংস আক্রমন করছে। তাদের তান্ডবে হাজার হাজার শিশু এবং অসহায় মুসলমান প্রাণ হারাচ্ছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন অসহায় মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং বর্বর আক্রমনের কারণে যালেম ইসরাইলকে শাস্তি প্রদান করেন। বিভিন্ন সংগঠন ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সাহায্য করছে এবং তাদের মাঝে ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করছে যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল তারপরও তারা যথাসাধ্য করছে। আমাদেরও উচিত তাদের সাহায্য করা। ইনশাআল্লাহ্ হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে এবং জামাতীভাবেও সাহায্য করা হবে। আপনাদের মধ্যে যাদের সামর্থ আছে আপনারা দোয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সাহায্য করুন।

দোয়া কোন কাজে আসবে না। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে একদল নামাযীর নামায মুখে ছুড়ে মারার কথা বলেছেন সেভাবে এই আয়াত দু'টি পাঠ করা সত্ত্বেও এর উপর যারা আমল করবে না তাদের জন্য এ আয়াত অভিসম্পাত বয়ে আনবে। সফলতা লাভ করতে চাইলে নিজেদের ঈমান, আমল, বিশ্বাস ও সৎকর্মের যে শিক্ষা রয়েছে সে মোতাবেক জীবন যাপন করুন আর আপন কর্ম দ্বারা প্রমাণ করুন যে, খোদা'ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে পাপমুক্ত হয়ে সৎকর্মের পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের তৌফিক দিন।

খুতবার শেষ পর্যায়ে হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লার 'কাফী' বৈশিষ্ট্য বা গুণবাচক নামের সূত্র ধরে আরো কিছু আয়াত উপস্থাপন করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে বিষয়টি আজ এখানেই শেষ করছি বাদবাকী আগামী খুতবায় বলবো, ইনশাআল্লাহ।

এরপর হুযূর বলেন, বর্তমানে ইসরাইল নিরীহ এবং নিস্পাপ ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর অত্যন্ত বর্বর এবং নৃশংস আক্রমন করছে। তাদের তান্ডবে হাজার হাজার শিশু এবং অসহায় মুসলমান প্রাণ হারাচ্ছে। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন অসহায় মুসলমানদের সাহায্য করেন এবং বর্বর আক্রমনের কারণে যালেম ইসরাইলকে শাস্তি প্রদান করেন। বিভিন্ন সংগঠন ফিলিস্তিনি মুসলমানদের সাহায্য করছে এবং তাদের মাঝে ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করছে যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল তারপরও তারা যথাসাধ্য করছে। আমাদেরও উচিত তাদের সাহায্য করা। ইনশাআল্লাহ্ হিউম্যানিটি ফার্স্টের মাধ্যমে এবং জামাতীভাবেও সাহায্য করা হবে। আপনাদের মধ্যে যাদের সামর্থ আছে আপনারা দোয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সাহায্য করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তৌফিক দিন, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

‘ওয়াকফে জাদীদ এর ৫২তম বর্ষ আরম্ভ এবং বিশ্বের চলমান অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা সত্ত্বেও আহমদীদের কুরবানীর মান সমুন্নতই রয়েছে’

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ-صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالضَّآلِّيْنَ -

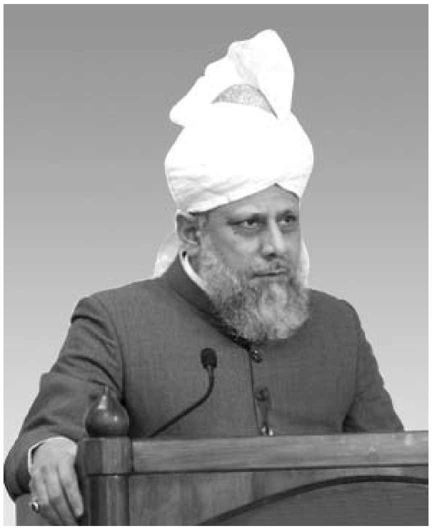

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ৯ই জানুয়ারী ২০০৯-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই:) বলেন, আজকের খুতবার মূল বিষয় আরম্ভ করার পূর্বে আমি গত খুতবার ধারাবাহিকতায় আরো কিছু কথা বলতে চাই। অবশ্য অধিকাংশ মানুষের জন্যই আমার খুতবার বিষয় সুস্পষ্ট ছিল কেননা জামাত এই বিষয়টি বুঝে এবং জানে আর জামাতী বই-পুস্তকেও এ সম্পর্কে প্রচুর লেখা হয়েছে। বিষয়টি দরূদ শরীফের বরাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর মোকাম এবং পদমর্যাদার সাথে সম্পর্ক রাখে। অনেকেই লিখেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) মহানবী (সা:)-এর আল্ বা বংশধরদের মাঝে সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী এবং আল্ হিসেবে তিনি সর্বাগ্রে। কেননা আগমনকারী মসীহ্‌র এই মহান মোকাম বা সম্মানের কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে আর তাঁর জন্য মহানবী (সা:)-এর অকৃত্রিম ভালবাসার বহি:প্রকাশও আমরা দেখতে পাই। বন্ধুদের এই ধারণা একেবারেই সঠিক, মহানবী (সা:)-এর এই আধ্যাত্মিক সন্তানের প্রতি তাঁর একান্ত ভালবাসার কথা তিনি (সা:) স্বয়ং বলেছেন। কিন্তু আমি যেহেতু মহররমের বরাতে কথা বলেছিলাম তাই শিয়া এবং সুন্নিদের মাঝেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। আমি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেছিলাম যে, আপনারা যদি মহানবী (সা:)-এর কথা স্মরণ রাখেন যে, **‘মুসলমান সে, যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ’** তাহলে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, হত্যাকান্ড ও যুলুম-নির্যাতন বন্ধ হয়ে প্রেম-প্রীতি এবং ভালবাসার মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হবার কথা। এ সম্পর্কে মহানবী (সা:) বলেন,

مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهٗ وَدَمُهٗ وَحِسَابُهٗ عَلَى اللّٰهِ

(মুসলিম)

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি বলে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয় তাকে অস্বীকার করে তার প্রাণ ও সম্পদের সম্মান আবশ্যক; বাকী তাঁর হিসাব-নিকাশ খোদার উপর ন্যস্ত।’ তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন সে সিদ্ধান্ত খোদাই করবেন। মহানবী (সা:) বলেছেন, **‘যদি কেউ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ বলে, তা সে মুসলমানের ভয়েই বলুক না কেন, যদি তুমি এরপরও তাকে হত্যা কর তাহলে তুমি তার স্থান গ্রহণ করবে আর সে তোমার স্থান পাবে।’** সুতরাং এভাবেই মহানবী (সা:)

একজন মুসলমানকে অপরের রক্তের হিফাযত করার শিক্ষা দিয়েছেন। আজ সকল মুসলমান যদি কলেমা এবং দরূদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে তাহলে বর্তমানে মহররম মাসে যেসব ঘৃণ্য অপকর্ম চলছে তা কখনই হতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলমানরা এ বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে বা অনুধাবন করতে পারে না। সম্প্রতি মহররম মাস সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় যা লেখা হচ্ছে তাও আমার কথাকে সত্যায়ন করছে। এ মাসে শিয়া-সুন্নি পরস্পরকে হত্যা করে। কি কারণে আজ তারা এমন করছে? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে যারা গ্রহণ করেনি তারাই এসব অপকর্মের হোতা। এরা মহানবী (সা:)-এর আধ্যাত্মিক সন্তানকে মানেনি যার সম্পর্কে স্বয়ং তিনি (সা:) বলেছেন, **'বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যদি যেতে হয় তবুও তোমরা তাঁর কাছে যাবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে।'** অনুরূপভাবে আরো অনেক হাদীস রয়েছে যার আলোকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আগমনকারী মসীহ্র প্রতি মহানবী (সা:)-এর একটি বিশেষ ভালবাসা রয়েছে। মহানবী (সা:)-এর সাথে মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর সম্পর্ক ছিল অনুপম। গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর একটি কাশ্ফ বা দিব্যদর্শনের কথা উল্লেখ করেছিলাম তাতে তিনি দেখেছিলেন যে, **'হযরত ফাতেমাতুজ্ জাহরা একজন মমতাময়ী মায়ের মত তাঁর মাথা নিজ উরুতে রেখেছিলেন।'** সেখানে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা:) এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাসত্ত্বেও তাঁর মাথা নিজ উরুতে রাখা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) মহানবী (সা:)-এর আল্ বা বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) দাবীর পূর্বে একবার মারাত্মকভাবে অসুস্থ্য হলে ইলহামে তাঁকে একটি দোয়া শিখানো হয় যে,

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
اللهم صل على محمد وال محمد

(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আলাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ)।

এই ইলহামেও 'আলা' অব্যয় ব্যবহার না করে শুধু 'আল্'এ মুহাম্মাদ শব্দের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর মোকাম এবং পদমর্যাদা স্বয়ং মহানবী (সা:) নির্ণয় করে দিয়েছেন। মহানবী (সা:)-এর বংশধরদের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে নিকটতম হচ্ছেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)। অন্যরা এটি মানুক বা না মানুক আমাদের দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) সরাসরি মহানবী (সা:)-এর আল্ বা বংশধরদের শিরোমণি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-ও স্বয়ং বলেছেন, **'মহানবী (সা:)-এর প্রতি অজস্র ধারায় দরূদ প্রেরণ আর আন্তরিক ভালবাসা ও অনুরাগের মাধ্যমে তিনি এই মর্যাদা লাভ করেছেন।'** সুতরাং এদিক থেকেও আজ জামাতে আহমদীয়ার অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। মুসলমানদের মাঝে আজ পারস্পরিক যে ভুল বুঝাবুঝি এবং মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য বেশি বেশি দরূদ পাঠ করুন কেননা, আমরা সেই যুগইমামকে মেনেছি যাকে আল্লাহ্ তা'লা সরাসরি মহানবী (সা:)-এর আল্ বা বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। মুসলমানদের চরম স্বার্থপরতার স্বরূপ বর্তমানে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। আজ যখন ফিলিস্তিনের উপর ইসরাইল নৃশংস হামলা করছে এমন নাজুক পরিস্থিতিতেও মুসলমান দেশগুলো সমবেতভাবে ও সমস্বরে কোন জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেনি। খুবই ক্ষীণকণ্ঠে দু'একটি স্থানে প্রতিবাদ দেখা গেলেও এদের চেয়ে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন খৃষ্টান সংগঠণ এবং ব্যক্তির প্রতিবাদ ছিল এরূপ বর্বর ইসরাইলী আক্রমনের বিরুদ্ধে বেশী জোরালো। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, মুসলমানদের চেতনা লোপ পেয়েছে। তাই আমি পুনরায় দোয়ার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি আর এটিই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এই দোয়ার মাধ্যমেই আমাদের বিজয় ত্বরান্বিত হবে। এরপর হুযূর বলেন, এখন আমি খুতবার দ্বিতীয় বিষয়ের দিকে আসছি। আপনারা জানেন যে, জানুয়ারীর প্রথম বা দ্বিতীয় জুমুআয় রীতি অনুসারে ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের সূচনা হয় এবং বিগত আর্থিক বছরের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়। আজ আমি বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরার পূর্বে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٩﴾

(সূরা আল্ হাদীদ:১৯)

অর্থ: 'নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণ এবং যারা আল্লাহ্কে অতি উত্তম ঋণ দান করে-তাদেরকে সম্মানজনক প্রতিদান বর্ধিতাকারে দেয়া হবে। তাদেরকে দেয়া হবে অতি সম্মানজনক পুরস্কার।' এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, **'তোমাদের অর্থ-কড়ি বা ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই খোদার। কিন্তু তিনি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন, যদি খোদার পথে তোমরা ব্যয় করো তাহলে সেটিকে তিনি কর্জে হাসানা**

(উত্তম ঋণ) গণ্য করে তোমাদেরকে তা ফেরত দিবেন।' এটি বান্দাদের প্রতি খোদার ভালবাসার বহি:প্রকাশ। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, পরবিমূখ, স্বনির্ভর, মানুষের ধন-সম্পদ বা টাকা পয়সার তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি জাগতিক ঋণ গ্রহীতাদের মত নন যারা ঋণ নিয়ে ফেরত দিতে ভুলে যায় বরং তিনি উত্তমভাবে বর্ধিতাকারে ঋণ প্রত্যর্পণ করেন। আজ ধর্মের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হচ্ছে তা খোদার দরবারে এতটাই গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা রাখে যা আপনারা ভাবতেও পারবেন না; কিন্তু শর্ত হচ্ছে খোদাপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা করতে হবে আন্তরিকভাবে। বর্তমান যুগে মানুষ উন্মাদের মত জাগতিকতা এবং বস্তুবাদিতার পিছু ছুটছে এ সময় যদি কেউ কেবল খোদার খাতিরে কুরবানী করেন তাহলে তা গভীরভাবে মূল্যায়িত হবে।

হুযূর বলেন, আর্থিক কুরবানী গৃহীত হবার অভিজ্ঞতা শুধু অতীতের বিষয় নয় বরং এটি প্রতিনিয়ত আমাদের যুগেও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি আমাদের জন্য একটি বড় নিয়ামত যা আমরা বয়'আত করার সুবাদে লাভ করছি। এই নিয়ামতের জন্য যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন না কেন তা যথেষ্ট হবে না। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতের সদস্যরা এই গূঢ় তত্বটি বুঝেন বলেই প্রতি বছর কুরবানীর মান উন্নত হচ্ছে। এবছর সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করা সত্ত্বেও খোদার কৃপায় আহমদীরা আর্থিক ত্যাগের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখান নি। তারা এ কথা একটুও ভাবেন না যে, আমাদের চলবে কিভাবে। তাঁদের চিন্তা একটাই কিভাবে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা হবে। অপরদিকে কুরআন বিপরীত চিত্রও তুলে ধরেছে আর সে প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সাবধান করে বলেন যে, ইবাদত বা আর্থিক কুরবানী যাইহোক না কেন এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করবেনা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ
وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ
كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ
فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا وَفِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

(সূরা আল্ হাদীদ:২১)

অর্থ: 'তোমরা জেনে রাখো, এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, চাক-চিক্য, সৌন্দর্য, তোমাদের মাঝে পারস্পরিক আত্মশ্লাঘা, এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা মাত্র; এর দৃষ্টান্ত সেই বারিধারার ন্যায় যার কল্যাণে উৎপাদিত শাকসবজি কৃষকদের চমৎকৃত করে, অত:পর তা পরিপক্ক হয় এবং তুমি একে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, যা অবেশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এবং পরকালে রয়েছে (বস্তুবাদীদের জন্য) কঠিন আযাব এবং (সৎকর্মশীলদের জন্য) খোদার পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। এবং এই পার্থিব জীবন ছলনাময়ী ভোগ্যবস্তু ব্যতিরেকে কিছু নয়।'

আজ সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শিক্ষানুসারে সুসংগঠিত ও জামাতবদ্ধভাবে একমাত্র আহমদীরাই খোদার খাতিরে কুরবানী করছে। বাকীরা করলেও তা অতি সামান্য। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার কাজে মত্ত; জাগতিক চাক-চিক্য ও বিভিন্ন কুপ্রথা ও হরেক রকম বি'দাত মুসলমানদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে। বিয়ে-শাদীর বেলায়ও এ ধরনের বেহুদা কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় এবং মানুষ অনেক অযথা খরচ করে।

হুযূর বলেন, প্রসঙ্গক্রমে এখানে এটিও বলে দিচ্ছি যে, বিভিন্ন আহমদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসে। আপনারা যদি যুগ ইমামকে মানার পরও তাদেরই অন্ধ অনুকরণ করেন আর মসীহ্ মওউদ (আ:)-এর হাতে বয়'আতের উদ্দেশ্য ভুলে বসেন তাহলে আপনারাও তাদের মতই যাদের সম্পর্কে খোদা বলেন জেনে রাখ, ইহলৌকিক জীবন কেবল ক্রীড়া-কৌতুক ও ভোগ-বিলাস বৈ আর কিছু নয় এবং এর সবই সাময়িক ও অস্থায়ী। যুগ ইমামকে মানার পরও যদি আমাদের ভেতর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে অহমিকা থাকে এবং ইহজীবন নিয়ে যদি অহংকার করি তাহলে আমরা আজরে আজীম অর্থাৎ মহা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবো। আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছি তা নিয়ে অহমিকা বা গর্ব করবে না বরং খোদার পথে এই ধন-সম্পদ হতে খরচ করো তাহলে উত্তম প্রতিদান পাবে। পার্থিব সম্পদ অস্থায়ী, এর উপমাস্বরূপ সেই কৃষকের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, ফসল পাকতে দেখে খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে বিভিন্ন রঙিন স্বপ্ন বুনতে থাকে কিন্তু ফসল ঘরে উঠানোর পূর্বেই আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে সব হারিয়ে কৃষক সর্বশান্ত হয়। মনে রাখবেন! যে খোদাকে ভুলে যায় সে ইহকালীন ব্যর্থতার পাশাপাশি পরকালের শাস্তিও ভোগ করবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۲﴾

(সূরা আল্ হাদীদ:২২)

অর্থ: **'(হে লোক সকল!) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং এমন জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার মূল্য আকাশ ও পৃথিবীর মূল্যের সমতুল্য, এটি ঐসব লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনে। এটি আল্লাহ্র একান্ত কৃপা, তিনি যাকে চান দান করেন বস্তুত: আল্লাহ্ মহা ফযলের অধিকারী।'** এখানে একজন মু'মিনের কর্তব্য সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন যে, সে সর্বদা তাঁর প্রভুর ক্ষমা সন্ধান করে ফলে সে সেই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হয় যা ইহ ও পর উভয় জগতে লাভ করবে।

হুযূর বলেন, আমি এমন অগণিত চিঠি পাই যাতে জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্য-সদস্যারা, আর্থিক কুরবানী করার পর ধন-সম্পদ ও জনবলে শক্তিশালী হওয়ার ঘটনা তুলে ধরেন একই সাথে তারা যে কত অসাধারণ মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন তাও বিবৃত করেন। এটিই মূলত: জান্নাত আর এরূপ জান্নাত লাভের ফলে মু'মিন ইহকালেও খোদার সন্তুষ্টি লাভ করে আর পরকালের প্রতি তাদের ঈমান আরো দৃঢ়তর হয়। একটি জামাতের সেক্রেটারী মাল সাহেব আমাকে লিখেছেন যে, **'জামাতের এক সদস্য তার কাছে এসে বলেন, এ হচ্ছে আমার ওয়াদা এবং এই হচ্ছে টাকা; নববর্ষের ঘোষণা হওয়া মাত্র সর্ব প্রথম আমার নামে রশীদ কাটবেন।'** এ ধরনের নিষ্ঠাবান এবং আন্তরিক লোকদের জন্যই আল্লাহ্ বলেছেন, جَنَّةٍ عَرْضُهَا অর্থাৎ তাদের জন্য জান্নাত বিস্তৃত করা হবে আর এ বিস্তৃতির কোন সীমা-পরিসীমা নেই আর জান্নাতের আসল অর্থ হচ্ছে খোদার সন্তুষ্টি।

একদা একজন সাহাবী মহানবী (সা:)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, **'জান্নাত যদি আকাশ এবং পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রাখে তাহলে জাহান্নাম কোথায়? উত্তরে মহানবী (সা:) বলেন, যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় যায়? তিনি (সা:) বলেন, যেভাবে সূর্য উদয়ের ফলে আঁধারের অবসান ঘটে তেমনিভাবে জান্নাত এবং জাহান্নাম একই সময় সহাবস্থান করছে।'** খোদা তা'লাকে যারা বিস্মৃত হয় তারা যেথায় জাহান্নাম দেখে খোদাভক্তরা সেখানেই জান্নাত উপভোগ করেন; শুধু দৃষ্টিকোন পরিবর্তনের প্রয়োজন। তাই মু'মিন খোদার সন্তুষ্টির প্রতি দৃষ্টি রাখে। যে বস্তুবাদী তার দৃষ্টি থাকে বস্তু জগতের প্রতি। আমি বলেছি, জান্নাত হলো খোদার সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা আমাদেরকে এই জান্নাতের প্রতি মনোযোগী হবার তৌফিক দিন। আমাদের ত্যাগ, ইবাদত ও আমাদের কুরবানী যেন খোদার কৃপাবারীকে আকর্ষণ করতে পারে আমাদেরকে নিরবধি সে চেষ্টাই চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ্ বলেন,

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ, জান্নাত তাদের জন্য যাদের উপর খোদা তার বিশেষ অনুগ্রহ করেন আর তারা খোদা ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনেন। আর এ যুগে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছি। এটি আল্লাহ্র একান্ত কৃপা, তিনি যাকে চান তাকে দান করেন।

হুযূর বলেন, এ যুগের মসীহ্ (আ:) খোদা ও রসূলের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আবির্ভূত হয়েছেন। এটিও আমাদের প্রতি একান্তই খোদার ফযল। আল্লাহ্ তা'লা নিজ করুণায় আমাদেরকে তাঁর প্রেরিত পুরুষকে মানার তৌফিক দিয়েছেন এখন আমাদেরকে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে যে,

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

(সূরা আল্ ইমরান:৯)

অর্থ: ' হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেবার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না।' মোটকথা যুগ ইমামকে মানার পর ইহজাগতিক ক্রীড়া-কৌতুক এবং চাক-চিক্য যেন আমাদের হৃদয়কে সত্য থেকে বিমুখ না করে। কখনো যেন মনে এ ধারণা না জন্মে যে, এত প্রকার চাঁদা আমাদের জন্য একটি বোঝা বরং সবসময় এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, খোদার ফযল বলেই আমরা তাঁর মনোনীত জামাতের জন্য কিছু করতে পারছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ যুগে পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত করেছেন এবং নিজ ধর্মের খাতিরে কুরবানী এবং ত্যাগ স্বীকার করার তৌফিক দিচ্ছেন। আমাদের উপর বর্ষিত খোদার এই অনুগ্রহরাজি বংশ পরম্পরায় খোদা তা'লা বলবৎ রাখুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) একস্থানে বলেন, **'চাঁদা দিলে ঈমান উন্নত হয় আর এটি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার প্রমাণ।'** অতএব সহস্র সহস্র মানুষ যারা বয়'আত করেন তাদেরকে বলা আবশ্যক যে, তোমরা শুরু থেকেই খোদার পথে আর্থিক কুরবানী করো। অনেক আহমদী চাঁদা দেবার বেলায় এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে নবাগতদের চাঁদার ব্যবস্থাপনায় সঠিকভাবে শামিল করা হয়নি, যদি সামান্য পরিমানও নেয়া হয় তাহলে তাদের মাঝে পুণ্যকর্মের একটি উন্নত অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে। যেখানকার জামাত এটি করেছে তারা চমৎকার ফল পেয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদের প্রতি ফযল করেছেন, কোন পুণ্যের কারণে তাদেরকে মহানবী (সা:)-এর আহবানে সাড়া দিয়ে যুগ মসীহ্কে

মানার সুযোগ দিয়েছেন। আপনারা নিজেরা চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হোন এবং আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এই বাবরকত নেযামে অন্তর্ভূক্ত হতে উৎসাহিত করুন। বিশেষ করে ওয়াকফে জাদীদ খাতে শিশুদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক পিতা-মাতাকে এই নেক কাজ করার তৌফিক দিন।

এরপর হুযূর পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে মালী কুরবানীর অপরিসীম গুরুত্বের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় সামগ্রীকভাবে জামাতের অগ্রযাত্রা ও উন্নতি অব্যাহত আছে। কোন কোন জামাত দুর্বলতা দেখালেও অন্যেরা সে ঘাটতি পূরণ করছে। যে রিপোর্ট আমি উপস্থাপন করছি তাতে পুরো চিত্র ফুটে উঠবেনা কেননা এখনও সব জায়গা থেকে রিপোর্ট এসে পৌঁছেনি। যাইহাক, ওয়াকফে জাদীদ এর ৫১তম বছর শেষ হয়ে ৫২তম বছর আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে গোটা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাভাব বিরাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহ্র ফযলে আহমদীদের কুরবানীর চেতনাকে তা এতটুকু প্রভাবিত করতে পারেনি। এ বছর বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া ওয়াকফে জাদীদ খাতে মোট একত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাউন্ড চাঁদা দিয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় সাড়ে সাত লক্ষ পাউন্ড বেশি। এ খাতে চাঁদা প্রদানকারী বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশ হলো যথাক্রমে: পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, জার্মানী, ভারত, ইন্দোনেশীয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড। পাকিস্তানে চাঁদা দাতার সংখ্যা গতবারের চেয়ে দশ হাজার বেড়েছে। আপনারা জানেন, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ আহমদীই দরিদ্র তাদের জন্য সেই দৃষ্টান্তই প্রযোজ্য যা একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি। **'একবার মহানবী (সা:) বলেছেন, এক দেরহাম একলক্ষ দেরহামের তুলনায় এগিয়ে গেছে, জিজ্ঞেস করা হলো যে, কীভাবে? রসূলুল্লাহ্ (সা:) বলেন, একজনের কাছে শুধু দু দেরহাম ছিলো আর সে তাহরীক শুনে এর মধ্যে থেকে এক দেরহাম চাঁদা দিয়েছে। অন্য আরেকজনের কাছে লক্ষ লক্ষ দেরহাম ছিলো আর সে এরমধ্যে থেকে এক লক্ষ দেরহাম চাঁদা দিয়েছে। যদিও সে পরিমাণে অর্থ বেশি দিয়েছে কিন্তু কুরবানীর দিক থেকে এক দেরহামের মূল্য খোদার দৃষ্টিতে অনেক বেশি।'** পাকিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দরিদ্র দেশের অবস্থাও অনুরূপ, তারা সীমিত সাধ্য সত্ত্বেও অসাধারণ কুরবানী করছেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আমেরিকা জামাত এবছর এই খাতে ২৫৬ জনকে নতুনভাবে শামিল করেছে। কিন্তু তাদের সম্মিলিত চাঁদা গত বছরের তুলনায় ৭৯হাজার ডলার কম। এদের মোট চাঁদা দাতার সংখ্যা হচ্ছে ৮২৭৬জন। উন্নত বিশ্বের জামাতগুলোর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। তারা এ খাতে যে চাঁদা দিয়ে থাকে তা ভারত এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দরিদ্রাঞ্চলে মিশন হাউস, মসজিদ নির্মাণ ও বই-পুস্তক প্রকাশ ও অন্যান্য খাতে ব্যয় করা হয় তাই আপনাদের উচিত চাঁদাদাতার সংখ্যা আরো বাড়ানো। তৃতীয় স্থান অধিকারী জামাত যুক্তরাজ্য যারা গত বছরের তুলনায় এবছর ৮৬ হাজার পাউন্ড বেশি আদায় করেছে। ১৩৮২জন নতুন যোগ হয়েছে এখন এদের মোট চাঁদাদাতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৫১৯-এ। আল্লাহ্র ফযলে যুক্তরাজ্য জামাতের উন্নতির গতি খুবই প্রশংসনীয়। চতুর্থ স্থানে আছে কানাডা, এই জামাতও এ বছর ১লক্ষ ৮০হাজার ডলার বেশি আদায় করেছে আর ৩৭৮জন চাঁদা দাতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কানাডার দফতর আতফালও বেশ সক্রিয়। তাদের মোট চাঁদাদাতার সংখ্যা হচ্ছে ১৩,৩২৫ জন। পঞ্চম হচ্ছে জার্মানী আর এ জামাতও ৩২ হাজার ইউরো বেশি দিয়েছে কিন্তু ১৩৮৭জন চাঁদাদাতা কমে গেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী বেশ ভারী সংখ্যক আহমদী চলতি বছরগুলোতে জার্মানী থেকে যুক্তরাজ্যে চলে এসেছে বলে তাদের চাঁদা দাতার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু আমার মতে চেষ্টাতেও কিছু ত্রুটি আছে। ষষ্ঠ স্থানে আছে ভারত আর তারাও এবছর ১৭লক্ষ রূপী বেশি আদায় করেছে আর মোট চাঁদাদাতার সংখ্যা হচ্ছে ১লক্ষ ১৬হাজার ১২০জন। ভারতকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে কেননা, বর্তমান বিশ্বের যে অবস্থা তাতে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা বলা যায় না। ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে সাহায্য করা হচ্ছে কিন্তু হতে পারে যে, একটি সময় আসবে যখন সাহায্য করা সম্ভব হবে না। তাই আফ্রিকা এবং ভারতকে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। সপ্তম স্থানে আছে ইন্দোনেশীয়া, তারাও ৩২৯০৮ পাউন্ড বেশি আদায় করেছে আর চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৮২৯জন। এরপর যথাক্রমে আছে বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড।

মাথাপিছু আদায়ের দিক থেকে প্রথম পাঁচটি দেশ হচ্ছে যথাক্রমে: আমেরিকা, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং বেলজিয়াম।

আফ্রিকার দেশসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করেছে নাইজেরিয়া এরপর পর্যায়ক্রমে ঘানা, বুর্কিনাফাঁসো, বেনিন এবং সিয়েরালিওন এর অবস্থান। ওয়াকফে জাদীদ খাতে আল্লাহ্র ফযলে এবছর মোট পাঁচ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার নিষ্ঠাবান আহমদী চাঁদা দিয়েছেন আর এ বছর চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সাতাইশ হাজার। হুযূর বলেন, আপনারা এ সংখ্যা আরো বাড়াতে পারেন। আতফাল ও নাসেরাতের কাছ থেকে পঞ্চাশ পেনি নিয়ে হলেও তাদেরকে চাঁদায় অভ্যস্ত করুন আর নবাগতদের কাছ থেকে টোকেন স্বরূপ সামান্য অর্থ নিয়ে হলেও তাদেরকে এতে অন্তর্ভূক্ত করুন। এরপর হুযূর পাকিস্তানসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থাৎ স্থানীয় পরিসংখ্যান বর্ণনা করে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সকল চাঁদাদাতা এবং আর্থিক কুরবানীকারীর কুরবানী কবুল করুন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জনবলে অশেষ বরকত দিন, আমীন।

(প্রাপ্ত সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক, লন্ডন)

আল্লাহ্ তাআলার কাছে মুসলমানদের অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত

হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)

আল্লাহ্ তাআলার কাছে মুসলমানদের অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা তিনি তাদেরকে এমন একটি ধর্ম দান করেছেন যা জ্ঞানের দিক থেকে, কর্মের দিক থেকে, প্রত্যেক প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি ও অশ্লীলতাপূর্ণ কথা-বার্তা এবং সব রকমের অকল্যাণ থেকে পবিত্র। মানুষ যদি গভীর মনোনিবেশ ও চিন্তাসহকারে দেখে তাহলে সে জানতে পারবে, প্রকৃতই সব রকমের প্রশংসা ও গুণের যোগ্য হলেন আল্লাহ্ তাআলা। আর কোন মানব বা সৃষ্টি প্রকৃত ও সত্যিকার অর্থে প্রশংসা ও গুণের অধিকারী নয়। মানুষ যদি স্বার্থহীনভাবে দেখে তাহলে তার নিকট সহসা এটা প্রতীয়মান হবে, কোন সত্তা যদি প্রশংসার অধিকার লাভ করে তাহলে হয়ত সে এজন্যে অধিকারী হতে পারে যে, কোন এক যুগে যখন কোন সত্তা ছিলো না এবং সত্তার কোন সংবাদও ছিলো না তখনও তিনি ছিলেন তাদের সৃষ্টিকর্তা। অথবা এ কারণে, এমন যুগে যখন কোন সত্তা ছিলো না আর জানাও ছিল না যে, সত্তা, সত্তার অমরত্ব, স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য কী কী উপকরণের প্রয়োজন তখনও তিনিই সেসব উপকরণ সরবরাহ করেছেন। অথবা এমন এক যুগে যখন তাদের ওপরে বহু বিপদ-আপদ আসতে পারতো অথচ তিনি দয়া করেছেন এবং তাদেরকে নিরাপদে রেখেছেন। আর হয়ত এ কারণেও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন, তিনি পরিশ্রমীর পরিশ্রম নষ্ট করেন না, পরিশ্রমীর পাওনা পুরোপুরি দিয়ে দেন। যদিও বাহ্যত মজুরীর জন্যে যে কাজ করে তার অধিকার প্রদান এক রকম বিনিময়; কিন্তু এমন ব্যক্তিও অনুগতশীল হতে পারেন যিনি পুরোপুরি পাওনা আদায় করে দেন। এসব উচ্চ পর্যায়ের গুণই কাউকে প্রশংসা ও গুণগানের অধিকারী করতে পারে।

> ***পুণ্যস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের বড়ই সুযোগ লাভ হয়েছে যেন তারা ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ়তা লাভ করে। এসব কথা বাদেও ঈমানের দৃঢ়তার জন্যে যে বিষয় আবশ্যক আর খুবই আবশ্যক তাহলো খোদা তাআলার সেসব নিদর্শন যা সেসব ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হয়-যাঁরা খোদা তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসেন এবং নিজ কর্ম-কান্ড দিয়ে হারানো সত্যতাসমূহ ও তত্ত্বজ্ঞানকে জীবিত করেন। সুতরাং খোদা তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, তিনি এ যুগে এমন ব্যক্তিকে পুনরায় ঈমান সঞ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং এজন্য প্রেরণ করেছেন যেন লোকেরা দৃঢ়বিশ্বাসের শক্তিতে উন্নতি করে।***

এখন মনোযোগ সহকারে দেখে নাও, সত্যিকার অর্থে এসব প্রশংসার যোগ্য হবেন কেবল আল্লাহ্ তাআলা যিনি পরমোৎকর্ষের সাথে এসব গুণে বিভূষিত। আর কারো মাঝে এসব গুণ নেই।

প্রথমত সৃষ্টি ও লালন-পালনের গুণকেই দেখো। এ গুণ সম্বন্ধে যদিও মানুষ ধারণা করতে পারে যে, মা-বাবা ও অন্যান্য অনুগ্রহ পরায়ণের কোন স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে তারা অনুগ্রহ করে। এর দলীল-প্রমাণ এই ঃ যেমন, শিশু স্বাস্থ্যবান, সুঠামদেহী, সুন্দর ও নাদুস-নুদুস জন্ম নিলে মা-বাবা খুব খুশী হয়ে থাকেন। আর যদি পুত্র সন্তান হয় তাহলে পরে খুশী ও আনন্দ আরও বেড়ে যায়। ঢোল বাদ্য বাজানো হয় (আনন্দ স্ফূর্তি করা হয়)। কিন্তু যদি কন্যা সন্তান হয় তাহলে সেই ঘরে শোকের রোল ওঠে, সেই দিন শোক দিবস পালিত হয় এবং নিজের মুখ দেখানোরও যোগ্য মনে করে না। কখনও কখনও কোন বোকা বিভিন্ন চেষ্টা-প্রচেষ্টার দ্বারা কন্যাকে মেরে ফেলা বা তার লালন-পালনে অবহেলা দেখায়। শিশু খোঁড়া, অন্ধ, বিকলাঙ্গ হলে আকাঙ্ক্ষা করে সে মরে যাক। আর অধিকাংশ সময় আশ্চর্যের বিষয় এটা হয়, স্বয়ং নিজেই দুর্ভাগ্যের জীবন মনে করে মেরে ফেলে দেয়। আমি পড়েছি, গ্রীকবাসী এসব শিশুকে স্বেচ্ছায় মেরে ফেলে দিতো। বরং তাদের ওখানে সরকারী নির্দেশ ছিলো, কোন শিশু অকর্মণ্য, বিকলাঙ্গ, অন্ধ প্রভৃতি হয়ে জন্ম নিলে সত্বর তাকে মেরে ফেলা হোক। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, মানুষের ধারণাসমূহে লালন-পালন ও পরিচর্যার সাথে ব্যক্তিগত ও নিজস্ব উপদেশ মিশ্রিত থাকে; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির (যার বিবরণ দিতে কল্পনা ও ধারণা এবং ভাষা দুর্বল। আর যাতে আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ) নিকট লালন-পালনের কোন চাহিদা নেই। তিনি পিতা-মাতার ন্যায় সেবা ও জীবনোপকরণও চান

না। বরং তিনি সৃষ্টিকে কেবল লালন-পালনের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই এটা মেনে নেবে যে, চারা লাগানো, পানি দেয়া এবং এর পরিচর্যা করা এবং ফলবান বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা একটি বড় অনুগ্রহ। অতএব মানুষ ও তার অবস্থা এবং লালন-পালন সম্বন্ধে যদি তোমরা চিন্তা করো তাহলে জানতে পারবে, খোদা তাআলা কত বড় অনুগ্রহ করেছেন যে, এতসব উত্থান-পতন ও সহায়হীন অবস্থার সময়ে ও বার বার পরিবর্তনের সময় সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিকটি এখন আমি বর্ণনা করছি। জীবনের উন্মেষ ঘটার পূর্বে এমন উপকরণ যেন থাকে যা সৎ জীবন ও শক্তি নিচয় কার্যকরী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট হয়। দেখো! আমরা তখনো জন্মগ্রহণ করি নি অথচ তিনি এর পূর্বেই প্রয়োজনীয় জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন। উজ্জ্বল দিবাকর, যা এখন উদিত হয়েছে আর যার কারণে সাধারণভাবে আলো ছড়িয়ে পড়েছে; অথচ এটা না হলে আমরা কি দেখতে পারতাম অথবা আলোর দ্বারা যে উপকার ও কল্যাণ লাভ হয় আমরা কিসের মাধ্যমে তা পেতাম? সূর্য ও চন্দ্র বা কোন প্রকারের আলো যদি না হতো তাহলে দৃষ্টি শক্তি ব্যর্থ হতো। দেখার জন্যে যদিও চোখের এক প্রকার শক্তি আছে কিন্তু তা বাহ্যিক আলো ছাড়া অকেজো। অতএব এটা কতই অনুগ্রহ, শক্তিনিচয় থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে তিনি সেসব প্রয়োজনীয় উপকরণাদি আগেই প্রস্তুত করে রেখেছেন! আবার এটা কতই তাঁর করুণা, তিনি এমন সব শক্তি প্রদান করেছেন আর এসবের মাঝে স্বভাবত এমন যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, মানুষের পরিপূর্ণতা চরমোৎকর্ষ লাভের জন্যে যা অত্যধিক জরুরী! মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, শিরা- উপশিরায় এমন বৈশিষ্ট্যাবলী রেখে দিয়েছেন, মানুষ এতদ্‌দ্বারা উপকৃত হয় এবং সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিপূর্ণতা সাধন করতে পারে। এটা এজন্যে, শক্তিনিচয়ের পরিপুর্ণতার উপকরণ সাথে সাথে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এতো হলো অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার অবস্থা। প্রত্যেক শক্তি সেই ইচ্ছা ও উপকারের সাথে পূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক রাখে। এতে মানবের কল্যাণ নিহিত।

.......এটা নিয়মের কথা, অনুশীলনের মাধ্যমে যেভাবে দৈহিক-শক্তি পরিপূর্ণ হয়–বিকাশ লাভ করে, ঘোড়া যেভাবে সওয়ারের চাবুকের আঘাতে সঠিকভাবে চলে তেমনি ইংরেজদের আগমনে ধর্মের নিয়ম-নীতির ওপরে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ এসে গেল। আর নিজের সত্য-ধর্মে চিন্তাশীলগণের দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব লাভ হলো। আবার কুরআন করীমের বিরুদ্ধবাদীগণ যে যে স্থানে আপত্তি তুল্লো সেখান থেকেই চিন্তশীলগণের একটি তত্ত্ব-জ্ঞানের ভাণ্ডার লাভ হলো। আর সেই স্বাধীনতার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানও প্রভূত উন্নতি লাভ করলো। আর এ উন্নতি বিশেষভাবে এখানেই হয়েছে। এখন তুরস্ক বা সিরিয়ার কোন অধিবাসী, হোকনা, তারা যতই আলেম-ফাযেল যদি এসে যায় তাহলে তারা খৃষ্টানদের বা আর্য সমাজীদের আপত্তিসমূহের সুষ্ঠু জবাব দিতে পারবে না। কেননা, তাদের এরূপ স্বাধীনতা ও খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন ধর্মের নিয়ম-নীতির তুলনামূলক চর্চার সুযোগ ঘটে নি। মোটকথা যেভাবে বাহ্যিকভাবে ইংরেজ সরকারের মাধ্যমে দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি আধ্যাত্মিক নিরাপত্তাও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু আমাদের সম্পর্ক ধর্মের সাথে ও আধ্যাত্মিকতার সাথে তাই আমরা অধিকতর সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো যা ধর্মীয় অনুশাসনাদি প্রতিপালনে সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে। সুতরাং স্মরণ রাখা উচিত, মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও প্রশান্তির সাথে ইবাদত বন্দেগী তখনই করতে সক্ষম হয় যখন এর মাঝে চারটি শর্ত নিহিত থাকে। আর এগুলো হলো ঃ

প্রথম হলো সুস্বাস্থ্য ঃ

কোন ব্যক্তি যদি এমন দুর্বল হয় যে, বিছানা থেকে উঠতে পারে না সেক্ষেত্রে সে কিভাবে নামায-রোযার অনুশাসন পালন করতে পারে? পুনরায় সে এভাবেই হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পালনের ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে থাকবে। এখন দেখা উচিত, সরকারের মধ্যস্থতায় আমাদের শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্যে কি পরিমাণ সুবিধাদি লাভ হলো। প্রত্যেক বড় শহরে ও ছোট শহরে হাসপাতাল অবশ্যই আছে। সেখানে খুবই স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ও সহানুভূতির সাথে রুগীদের চিকিৎসা করা হয়। আর ঔষধ-পথ্যাদি বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। কখনও হাসপাতালে রেখে এমনভাবে তাদের দৃষ্টিপটে রেখেও সেবা-শুশ্রূষা করা হয় যে, কেউ নিজের ঘরেও সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে এবং আরামের সাথে চিকিৎসা করাতে পারে না। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে একটি আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ওপরে সারা বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। ছোট ও বড় শহরগুলোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যে বড় বড় জিনিষ-পত্র সরবরাহ করা হয়। দুর্গন্ধযুক্ত পানিও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নোংরা-ময়লা দ্রব্যাদি বিনষ্ট করার জন্যে আলাদা

ব্যবস্থা রয়েছে। আবার প্রত্যেক প্রকারের প্রভাবশালী ঔষধ-পত্র তৈরী করে খুব কম মূল্যে সরবরাহ করা হয়; এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু ঔষধ-পত্র নিজের ঘরে রেখেও প্রয়োজনের সময়ে চিকিৎসা করাতে পারে। বড় বড় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে চিকিৎসা বিদ্যার প্রসার ঘটানো হয়েছে। এমনকি গ্রামেও ডাক্তার পাওয়া যায়। কোন কোন মারাত্মক ব্যাধি যেমন বসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোধকল্পে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইদানিং কালে প্লেগের ব্যাপারে যেভাবে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থাদি নেয়া হয়েছে তা খুবই প্রশংসার দাবী রাখছে। মোটকথা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সরকার সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করছে। আর এমনিভাবে ইবাদত বন্দেগী করার জন্যে প্রথম প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণার্থে অনেক সহযোগিতা করেছে।

দ্বিতীয় শর্ত হলো ঈমান বা বিশ্বাস ঃ

খোদা তাআলা ও তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি যদি বিশ্বাসই না থাকে এবং অভ্যন্তরভাগ বিধর্ম ও নাস্তিকতার বিষে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলেও ঐশী আদেশ-নিষেধ পালিত হতে পারে না। কারণ এই যে, বহু লোক বলে থাকে....এইহা জাগ মিঠহা তে আগলাকিন্ ডিট্হা অর্থাৎ এ জগত তো মিষ্টি দেখাই যায়, পরজগৎ কে দেখেছে? দুঃখের কথা এই যে, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে এক অপরাধীর ফাঁসি হতে পারে; কিন্তু এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী এবং অসংখ্য আওলীয়াগণের সাক্ষ্য মওজুদ থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ ধরনের নাস্তিকতা লোকদের অন্তর থেকে দূর হয়নি। প্রত্যেক যুগেই খোদা তাআলা নিজ শক্তিশালী নিদর্শনসমূহ ও অলৌকিক ঘটনাসমূহ দ্বারা বলেন-**আনাল মাওজুদ** অর্থাৎ আমি আছি; কিন্তু এসব মুর্খ কান থাকা সত্ত্বেও শুনছে না। মোটকথা এ শর্তও খুবই আবশ্যকীয় শর্ত। এজন্যেও ইংরেজ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হওয়া উচিত। কেননা, ঈমান ও ধর্মীয় শিক্ষার বিস্তৃতিও ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত। প্রেস ও ডাক বিভাগের কল্যাণে সর্বপ্রকার ধর্মীয় পুস্তকাদি পাওয়া যেতে পারে। আর পত্র-পত্রিকাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

পুণ্যস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের বড়ই সুযোগ লাভ হয়েছে যেন তারা ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ়তা লাভ করে। এসব কথা বাদেও ঈমানের দৃঢ়তার জন্যে যে বিষয় আবশ্যক আর খুবই আবশ্যক তাহলো খোদা তাআলার সেসব নিদর্শন যা সেসব ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হয়-যাঁরা খোদা তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসেন এবং নিজ কর্ম-কান্ড দিয়ে হারানো সত্যতাসমূহ ও তত্ত্বজ্ঞানকে জীবিত করেন। সুতরাং খোদা তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, তিনি এ যুগে এমন ব্যক্তিকে পুনরায় ঈমান সঞ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং এজন্য প্রেরণ করেছেন যেন লোকেরা দৃঢ়বিশ্বাসের শক্তিতে উন্নতি করে। সে এক কল্যাণকামী সরকারের শাসনামলে আবির্ভূত হয়েছে। সে কে? সে-ই তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। যেহেতু এটা স্বীকৃত কথা, যতক্ষণ পরিপূর্ণভাবে ঈমান লাভ না হয় মানুষ পুণ্যকর্মে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে পারে না। কোন দিক দিয়ে বা কোন অংশে ঈমানের যতই কমতি থাকবে ততই মানুষ কর্মে শিথিল থাকবে এবং দুর্বল হবে। এর ভিত্তিতে তাকে ওলী বলা হয় যার প্রত্যেকটি দিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। আর তিনি কোন দিক দিয়েই দুর্বল নন। তার ইবাদতগুলো উৎকর্ষ ও পূর্ণতার পোষাকে সজ্জিত।

('রোয়েদাদ জলসা দোয়া' বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত)

জলসা সালানা মোবারক হোক

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৮৫তম সালানা জলসার এ শুভ লগ্নে আমরা দেশের দুর-দুরান্ত থেকে আগত সকল জামা'তের সম্মানিত প্রতিনিধি ভ্রাতৃবৃন্দ এবং পাক্ষিক আহমদী'র পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এই মহতী জলসা আমাদের সকলের জন্য সবদিক থেকে বরকতমন্ডিত হোক এই কামনা করছি।

সম্পাদক

প্রখ্যাত ধর্মবেত্তা হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)

মূল ঃ মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান (রা.)
অনুবাদ ঃ মাওলানা ফিরোজ আলাম

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর প্রথম খলীফা হযরত আলহাজ্জ মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)

[আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকীতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক "হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)" থেকে অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হচ্ছে। পাঠকবৃন্দ সম্পূর্ণ পুস্তকটি পাঠে অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমরা আশা করছি]

মৌলভী নূরউদ্দীন সমসাময়িক যুগের একজন অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। তাঁর আশ্চর্যজনক সৃজনী চিন্তাধারা সর্বদা সঠিক প্রমাণিত হতো। তিনি তাঁর রোগীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। ধনী-দরিদ্র সকলেই তাঁর সর্বোত্তম চিকিৎসা পেতো আর এর সাথে তাঁর আন্তরিক দোয়াও অন্তর্ভুক্ত থাকতো। এক রাতে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আসেন যিনি স্ত্রীর প্রসব বেদনার কারণে চরম উদ্বেগাকুল ছিলেন। তার ভয় ছিল, মহিলা হয়ত সকাল পর্যন্ত মারা যাবে। মৌলভী সাহেব তাকে ঔষধ দিয়ে সেবন বিধি বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তিনি তার জন্য দোয়া করবেন এবং আরো বললেন, তাঁকে যেন রোগীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখা হয়। রাতে সে মহিলা সম্পর্কে তাঁকে আর কিছু জানানো হয় নি। পরের দিন প্রত্যুষে তিনি সে মহিলার খবরা-খবর নেয়ার জন্য লোক পাঠালে মহিলার স্বামী হাস্যোৎফুল্ল চেহারায় তাঁর কাছে এসে বলে, তার ঘরে ফেরার এক ঘন্টা পর তার স্ত্রী নিরাপদে এক সন্তান প্রসব করে এবং নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন করে। হযরত মৌলানা সাহেব বললেন, "আমাকে জানালেনা কেন?"

সে বলল, "মহোদয় যেহেতু চিন্তার আর কোন কারণ ছিলনা তাই আমি রাতে আর আপনাকে বিরক্ত করা সমীচীন মনে করিনি।"

"কষ্টের কথা বলছেন! আপনি কি জানেন, যখন আপনারা সবাই রাতের বাকী অংশ সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করছিলেন সেখানে নূরউদ্দীন একটি বারও চোখ বন্ধ না করে সময়টি বেদনাঘন দোয়ায় অতিবাহিত করছিলো।"

একবার লাহোর অবস্থান কালে তাঁকে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন হিন্দু মহিলার চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। তিনি এক আত্মীয়ের ইন্তেকালে অপর কয়েকজন মহিলার সাথে শোক প্রকাশ করছিলেন। দুঃখের আতিশয্যে সে মহিলা বারংবার মাথার উপরে হাত উঠাচ্ছিলেন। মহিলা একবার এত ঘন-ঘন হাত উঠান যে, তার হাত উপরেই শক্ত হয়ে যায় আর নিচে নামানো সম্ভব হয়নি। চিকিৎসকরা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। এমন কোন উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না যার মাধ্যমে বাহুর পেশীর কোমলতা বহাল হতে পারে। যখন তাঁকে সে মহিলার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তিনি তাকে দেখতেও চাইলেন না আর যে বৃহৎ কক্ষে ভদ্র মহিলা নিশ্চলা-স্থবির দাঁড়িয়ে ছিলেন সে কক্ষেও গেলেন না। তিনি মহল্লার সবচেয়ে সুদর্শন যুবককে ডেকে আনার পরামর্শ দিলেন। সে আসার পর তিনি তাকে কক্ষে প্রবেশ করে পরিকল্পিতভাবে ভদ্র মহিলার কাছে গিয়ে সত্যিকার অর্থে তাঁর কাপড় খোলার চেষ্টা করতে বললেন। সে নির্দেশ পালন করল। অসুস্থ মহিলা তার উদ্দেশ্য আঁচ করে ব্যাকুল হয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলো আর তার হাত নিচে নেমে এল। সেই মুহূর্তের ধাক্কা তাঁর স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক অবস্থা পুনর্বহাল করে ।

শুধু দৈহিক বা মানসিক চিকিৎসাই তাঁর একমাত্র বিশেষত্ব ছিল না বরং আধ্যাত্মিক চিকিৎসা ছিল তাঁর আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দু। তিনি আত্মার সংশোধন ও আরোগ্যের জন্য নিবেদিত ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁর মেটেরিয়া মেডিকা, তাঁর ফার্মোকোপিয়া, এবং চিরসাথী গ্রন্থ ছিল পবিত্র কুরআন। তিনি এটি মুখস্থ করেছেন। আর এ গ্রন্থের উপর তাঁর পান্ডিত্য ছিল অগাধ ও অসাধারণ। এ কুরআনে প্রজ্ঞার যে অফুরান ভান্ডার রয়েছে তা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার কোন সুযোগ তিনি নষ্ট করেন নি। যতক্ষণ নিজের চিন্তা-চেতনার উপর তার নিয়ন্ত্রণ ছিল তিনি কুরআন শিখানো অব্যাহত রেখেছেন। তিনি বলতেন, "কুরআন আমার রিয্ক এবং আমার আত্মার সতেজতার উৎস। দিনে আমি বেশ কয়েকবার এটি পড়ি কিন্তু আমার আত্মার চাহিদা কখনও মিটে না। এটি নিরাময়, এটি রহমত, এটি আলো, এটি হেদায়াত।" কুরআন কিভাবে পড়া উচিত, এ প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

"পৃথিবীতে পড়ার যোগ্য সবচেয়ে সহজ গ্রন্থ হলো কুরআন। এটিকে যদি পড়তে হয় তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো খোদাভীতি। আল্লাহ্ স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি মুত্তাকীকে (খোদাভীরু) কুরআন শিখাবেন। কুরআন পাঠের জন্য ছাত্রের সময় বের করা এবং জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা দরকার। যদি সে তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাকে এমন স্থান থেকে রিয্ক দেন যা সে ভাবতেও পারে না এবং তিনি তার অভিভাবক হয়ে যান।

কুরআন পাঠের দ্বিতীয় শর্ত হলো, খোদার প্রতি পুরো আত্মনিবেদনের প্রেরণা নিয়ে যথাযথভাবে চেষ্টা করা, তাহলে আল্লাহ্ সকল জটিলতা দূরীভূত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

কুরআন পাঠের নিয়ম হলো, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন এমনভাবে পাঠ করা যেন কুরআন তার উপর নাযেল হচ্ছে আর প্রত্যেক আয়াত তাঁর জন্য নাযেল হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেখানে আদম এবং ইবলীসের কথা বলা হয়েছে সেখানে তার আপন অবস্থা বিশ্লেষণ করা উচিত আর নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে সে কি আদম না ইবলীস? আর একই রীতি পুরো কুরআনে অনুসরণ করা উচিত।

পৃথিবীতে পড়ার যোগ্য সবচেয়ে সহজ গ্রন্থ হলো কুরআন। এটিকে যদি পড়তে হয় তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো খোদাভীতি। আল্লাহ্ স্বয়ং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি মুত্তাকীকে (খোদাভীরু) কুরআন শিখাবেন।

কোন স্থানে সে জটিলতার সম্মুখীন হলে তাকে তা চিহ্নিত করা উচিত। দ্বিতীয়বার পড়ার সময় স্ত্রী-বাচ্চাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সে দেখবে যে তার প্রথমবারের বেশিরভাগ জটিলতার সমাধান হয়ে গেছে। তৃতীয়বার পড়ার সময় তার বন্ধুদের শামিল করা উচিত আর চতুর্থবারে ব্যাপক গন্ডিকে কুরআন পাঠে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কুরআনের রহস্য উম্মেচনের জন্য তার অব্যাহতভাবে দোয়া করে যাওয়া উচিত।"

কুরআনের তফসীরের জ্ঞান ছিল তাঁর অসাধারণ। ১৮৯৩ সনে লাহোরে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় তাঁকে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি তাঁর বিষয়বস্তু হিসেবে যা বেছে নেন তাহলো 'আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর জ্যোতি'

"আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর নূর তাঁর নূরের উপমা হলো একটি তাক সদৃশ যার মধ্যে একটি একটি প্রদীপ আছে, সেই প্রদীপটি একটি গোলাকার কাঁচের চিমনির মধ্যে আছে সেই কাঁচের চিমনিটি এমনই দীপ্তিমান, যেন এটি একটি উজ্জ্বল তারকা। এটা (প্রদীপটি) এক এমন বরকতপূর্ণ যায়তুন বৃক্ষের (তৈল) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্বেরও নয় পশ্চিমেরও নয় (বরং এটি সারা বিশ্বের জন্য), এর তৈরী এমন যেন এক্ষণই এটা (স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে) জ্বলে উঠবে যদিও অগ্নি তাকে স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর! আল্লাহ্ যাকে চান নিজের নূরের দিকে পরিচালিত করেন। এবং আল্লাহ্ মানব-মন্ডলীর জন্য উপমাসমূহ বর্ণনা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী" (২৪ ঃ ৩৬)। তিনি এভাবে বক্তব্য আরম্ভ করেন। কতক শ্রোতা প্রাচ্যের ঐতিহ্য ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ আর যুবক শ্রেণী পশ্চিমা কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আমি যা বলতে চাই কুরআনের আলোকে তা প্রাচ্যেরও নয় আর পাশ্চাত্যেরও নয়। কুরআন করীম পৃথিবীর সমগ্র মানব-মন্ডলীর মঙ্গলের বিধান করে। এরপর তিনি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছেন এর আলোকেই বক্তৃতা অব্যাহত রাখেন আর শ্রোতারা পুরো বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করতে থাকেন।"[৩২]

সে অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের মাঝে বিহারের ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম মুবাল্লেগ, মৌলভী হাসান আলী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি তাঁর অনুভূতি নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করেন। "১৮৯৩ সালে আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে আমার যোগ দেয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, যেখানে

প্রখ্যাত মুফাস্‌সেরে কুরআন মৌলভী হাকীম নূরউদ্দীন এর সাথে সাক্ষাৎ হয়, যাঁর সমকক্ষ আলেম শুধু ভারতেই নয় বরং দূরদূরান্তে কোথায়ও নেই। ১৮৮৭ সালে পাঞ্জাব সফরেও আমি তাঁর অনেক প্রশংসা শুনেছি। কিন্তু এবার তিনি কুরআনের কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে এর এমন ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, তাঁর আলোচনায় আমি কত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। তাঁর বক্তৃতা শেষ হবার পর আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম, 'আজ আমি গর্বিত, আমার দু নয়ন এতবড় একজন আলেম ও মুফাস্‌সেরকে দেখেছে এবং মুসলমানদেরও গর্বিত হওয়া উচিত কেননা, তাদের মাঝে এতবড় একজন সুপন্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন।

মৌলভী হাকীম নূরউদ্দীনের সাথে আমার সাক্ষাতের গভীর আগ্রহ ছিল কিন্তু তিনি আমাকে সম্মান দিয়েছেন এবং স্বয়ং কাছে এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আমাদের কথপোকথন কালে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি হযরত মির্যা সাহেবের হাতে বয়াত করেছেন, আমাকে বলবেন কি এতে আপনার কি লাভ হয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি একটি পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাবার বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি। হযরত মির্যা সাহেবের হাতে বয়আতের পর আমি শুধু সে পাপ থেকে মুক্তই হইনি বরং আমার হৃদয়ে এর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে।"

"যদি তিনি আমাকে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কিছু নিদর্শন বা ভবিষ্যদ্বাণী শুনাতেন তাহলে আমি হয়ত খুব একটা গুরুত্ব দিতাম না কিন্তু তিনি যা বললেন তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।"

পরবর্তীতে মরহুম মৌলভী হাসান আলী কাদিয়ান এসেছিলেন, মসীহ্ মাওউদ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাঁর সাহচর্যে কিছু সময় অতিবাহিত করে তাঁর হাতে বয়আতও করেছেন। তিনি নিজেকে আহমদীয়া জামাতের একজন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ সদস্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর তবলীগে অনেক মানুষ আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

১৯০১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে একবার যখন মৌলভী নূরউদ্দীন লাহোর হয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি বড় সমাবেশে তাঁকে বক্তৃতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা হয়। তিনি কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন প্রমাণাদির আলোকে আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। জামাতের এক সদস্য বক্তৃতা শুনার জন্য সাথে জালাল উদ্দীন নামে রেলওয়ের এক কেরানীকে নিয়ে যায় যে গোঁড়া নাস্তিক ছিল। বক্তৃতা দুপুর ১.৩০ মিনিটে শেষ হয় এবং শ্রোতারা চলে যায়। পরের দিন কাজ থেকে ফিরে আসার সময় জালাল উদ্দীন তার বন্ধুর কাছে স্বীকার করলো, মৌলভী নূরউদ্দীনের বক্তৃতা শুনার পর সে তার পূর্বের অবিশ্বাসের জন্য অনুতপ্ত আর এখন সে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তায় বিশ্বাসী। এ ব্যক্তি নিশ্চিৎ ছিল যে কেউ তার যুক্তি খন্ডন করতে পারবে না।

১৯০২ সনের জুন মাসে এক হিন্দু যুবক কাদিয়ান এসে ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মৌলভী নূরউদ্দীনকে বলেন, তাকে ইসলামী রীতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি তাকে যা বলেছিলেন তা হলো:

"ইসলাম বলতে তিনটি বিষয়কে বুঝায়। প্রথমত এ বিশ্বাস করা যে, সর্ব নিয়ন্তা স্রষ্টা শুধু একজন। এমন স্রষ্টা তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই যার সামনে কোন ব্যক্তি নত হতে পারে বা যাঁর খাতিরে রোযা রাখা যেতে পারে বা যাঁর জন্য কোন প্রাণী জবাই করা যেতে পারে (কেননা তিনিই সমস্ত জীব জগতের প্রভু)। আর এমন কেউ নেই যাঁর খাতিরে তওয়াফ করা যেতে পারে। সকল আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল তিনিই হওয়া উচিত। এটিই হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ। সকল সুখ ও দুঃখের বিধান করা এবং সকল চাহিদা পূরণ করা তাঁর নিয়ন্ত্রণে। সকল আকুতি-মিনতি তাঁর কাছেই উপস্থাপিত হওয়া উচিত। এসব কিছুতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসের নাম হলো মুসলমান হওয়া। এর জন্য কোন আনুষ্ঠানিকতা বা বাপ্তাইজ হবার প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী সোপান হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল হিসেবে বিশ্বাস করা। তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে খোদার মহিমা, পবিত্রতা এবং প্রশংসা গাওয়া ও মানুষকে তা শিখানোর জন্য। অতএব ইসলামের দ্বিতীয় অংশ হলো মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। তৃতীয় দিক হলো, আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টির কল্যাণের জন্য কাজ করা। এর পাশাপাশি একজন মুসলমানকে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তা, কিতাব এবং কর্মের প্রতিফল তথা পরকালেও বিশ্বাস করা উচিত।

এগুলো বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়। এছাড়া একজন মুসলমানের নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, দরিদ্র ও অভাবীদের কল্যাণার্থে যাকাত দেয়া এবং যদি তার সামর্থ্য থাকে তাহলে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়া আবশ্যক।

সংক্ষেপে ইসলামের অর্থ হলো আন্তরিক বিশ্বাস। যে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে আর সেই মোতাবেক কাজ করে সে মুসলমান। সুতরাং তোমার এ বিশ্বাস থাকতে হবে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল।

কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন নেই, অবশ্য তোমার গোসল করে নেয়া উচিত যেন তুমি এভাবে দোয়া করতে পার, হে আল্লাহ্! আমি আমার দেহ ধুয়ে পরিষ্কার করছি তুমি আমার ভিতরকে ধুয়ে পরিষ্কার কর। একইভাবে খোলশ পরিবর্তনের প্রতিকস্বরূপ তুমি তোমার কাপড়ও পাল্টে নাও।”

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেই যুবকের নাম রেখেছেন আব্দুল্লাহ্। তিনি নূর হাসপাতালে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছেন। পরে ডাঃ আবদুল্লাহ্ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি একটি পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং খুব জনপ্রিয় ছিলেন ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশে ১৯০২ সনের অক্টোবর মাসে হযরত নূরউদ্দীন ফোনোগ্রাফে পবিত্র কুরআনের ১০৩ নম্বর সূরার তফসীর রেকর্ড করেন। এটা নিম্নরূপ:

“আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার দয়াকারী। আমরা পড়ন্ত দিবসকে স্যাক্ষী রেখে বলছি, মানুষ ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেবল তারা ছাড়া যারা ঈমান রাখে এবং সৎকর্ম করে আর পরস্পরকে সত্য অবলম্বন ও সত্যের উপর অবিচল থাকার উপদেশ দেয় (১০৩:১-৪)। এ সংক্ষিপ্ত সূরায় সমগ্র বিশ্বের মহাসম্মানিত, দয়ালু ও বারবার কৃপাকারী এবং বিচার দিবসের মালিক প্রভু একান্ত দয়াপরবশ হয়ে, তাঁর নৈকট্য, প্রশান্তি লাভ এবং সম্মান অর্জন ও উন্নতির বিভিন্ন পন্থা বর্ণনা করেছেন। প্রথমে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, আল্লাহ্‌র নবীদের যুগ এবং মানুষের বোধ-বুদ্ধির পরিপক্কতা ও বিভিন্ন কল্যাণকর অভিজ্ঞতা দিবসের শেষ অংশের মত বিষয়, যখন সূর্য ঢলে পড়ে। যেভাবে আসরের পর জামাতবদ্ধ হয়ে নামায পড়ার সুযোগ থাকে না, অথচ নামায আধ্যাত্মিক উন্নতি, খোদার নৈকট্য ও দোয়া করার সুযোগ নিয়ে আসে। একইভাবে আল্লাহ্‌র রসূলের যুগ যা মানুষের বোধ-বুদ্ধির সম্পূর্ণতা ও কল্যাণকর অভিজ্ঞতার সময় হয়ে থাকে এর অবসানের পর মানুষের হাতে ক্ষয়-ক্ষতি ও ঘাটতি কাটিয়ে উঠার আর সময় থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র রসূলের যুগে যখন মানুষের বোধ-বুদ্ধি একান্ত প্রখর থাকে তখন মানুষের (ক) খোদার সত্তা, তাঁর তৌহীদ ও অনন্যতা, তাঁর গুণাবলী ও মাহাত্ম্যে অদ্বিতীয় হওয়া, তাঁর ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্ট পবিত্র প্রেরণাকে বাস্তবায়ন, তাঁর ঐশী গ্রন্থ, রসূল, বিচার দিবস ও অন্যান্য ঈমানী বিষয়ে সত্য ও সঠিক জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাস স্থাপন (খ) এ সকল শাশ্বত সত্যের উপর পুরো বিশ্বস্ততার সাথে অনুশীলন (গ) জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সত্য প্রচার করে যাওয়া এবং (ঘ) অন্যদেরকে এ বিশ্বাস অনুযায়ী অনুশীলনের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার কাজ অব্যাহত রাখা উচিত যেন তারাও পুণ্যকর্মে অবিচল আর মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারে।”

১৯০৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কাদিয়ানে একজন নবাগত এভাবে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন: “আমি এবং আমার সাথী কাদিয়ানে প্রায় আসরের কাছাকাছি সময়ে পৌঁছি। আমাদেরকে মসজিদে আকসার দিকে পাঠানো হলো। নামাযের পর নামাযীরা একজন একান্ত সম্মানিত ব্যক্তির দেয়া দরস শুনার জন্য হাতে কুরআন নিয়ে বৃত্তাকারে বসলেন। তিনি এমনভাবে কুরআনের একটি অংশ তেলাওয়াত এর মাধ্যমে আরম্ভ করলেন যা শ্রোতাদের উপর জাদুর মত প্রভাব বিস্তার করল এবং তাদের গভীরভাবে আন্দোলিত করল। এরপর তিনি তেলাওয়াতকৃত আয়াতগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করে এতে অন্তর্নিহিত দর্শন ও প্রজ্ঞার উপর আলোকপাত করেন। এমন ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। আমার হৃদয় গভীরভাবে অভিভূত হলো। আমি পাশে বসা ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তিনিই কি প্রতিশ্রুত মসীহ্?’ তিনি বললেন, না, ইনি মৌলভী নূরউদ্দীন।’ আমি হতভম্ব ছিলাম যে, যদি এই কামেল পুরুষ শুধু শিষ্য হয়ে থাকেন তাহলে গুরু কত মহান হবেন!”

বদর পত্রিকার সম্পাদক যিনি স্বয়ং অনেক বড় একজন আলেম ছিলেন, তিনি মৌলভী নূরউদ্দীনের প্রাত্যহিক কুরআন ক্লাস সম্পর্কে এভাবে মতামত ব্যক্ত করেন: “তিনি কুরআনের এ দরস কেবল কাদিয়ানেই আরম্ভ করেন নি বরং দীর্ঘকাল থেকে তিনি এভাবে কুরআনের কাজ করে আসছেন। জম্মু ও কাশ্মীরে আমি যখন তাঁর কুরআন ক্লাসে বসা আরম্ভ করি তখন আমি ছোট ছিলাম। সেসব ক্লাসই আমাকে সত্যিকার অর্থে মুসলমান বানিয়েছে আর এসব দরসই পরে আমাকে আহমদী করেছে। এ ক্লাস আমার জন্য এত উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যে, বেশ কয়েক বছর দৈনিক এ ক্লাসে যোগ দেয়ার ফলশ্রুতিতে আজও আমি প্রত্যহ এসব ক্লাসের তাজা ফল উপভোগ করি। তাঁর কুরআন ক্লাসের অনন্য বৈশিষ্ট হলো, যুবক-মধ্যবয়সী এবং বৃদ্ধ সকলেই স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুসারে এ দরস থেকে লাভবান হয়েছে। অজ্ঞ ব্যক্তিও কিছুটা লাভবান হতো আর এ ক্লাস শুনে এক জ্ঞানীর জ্ঞানেও নতুন মাত্রা যোগ হতো। কাদিয়ানকে যারা আবাস হিসেবে অবলম্বন করেছেন তারা যে সব বড়-বড় নিয়ামত উপভোগ করেছেন তন্মধ্যে এ ক্লাসগুলো অন্যতম। আল্লাহ্‌তা’লা চিরকাল এর রক্ষণাবেক্ষণ করুন যেন আমরা এর মাধ্যমে সদা

খোদার আশিস ও রহমতের ভাগী হতে পারি।”

মৌলভী নূরউদ্দীন প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ্ যদি জিজ্ঞেস করেন, তুমি সবচেয়ে বেশি কী পছন্দ করবে? উত্তরে তিনি তাঁর কাছে কুরআন চাইবেন।

লেখকের পিতা ওকালতী জীবনের শেষ কয়েক বছরে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেছেন। তিনি যখন মৌলভী নূরউদ্দিনের কাছে এর উল্লেখ করেন তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন এবং উপস্থিত লোকদের সম্বোধনপূর্বক বলেন: “নাসরুল্লাহ্ খান মৌলভী নূরউদ্দীনকে এতটাই ভালবাসেন যে তাঁর ভালবাসা লাভের জন্য তিনি নিজ স্মৃতিপটে সে গ্রন্থকে স্থান দিয়েছেন যাকে নূরউদ্দীন সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। আর এভাবে নিজের জন্য নূরউদ্দীনের ভালবাসা পাওয়া নিশ্চিত করলেন।”

হাফেয রওশন আলী সাহেব তাঁর বিশিষ্ট-স্থানীয় একজন ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, “যখন আমি উজিরাবাদে আমার মামা হাফেয গোলাম রসূল সাহেবের তত্ত্বাবধানে কুরআন হিফয করছিলাম একরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, একজন সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে দুধ ভর্তি একটি পেয়ালা দিয়ে বললেন, ‘পান করো।’ আমি এর বেশিরভাগ পান করলাম। তিনি বললেন, ‘আরো পান করো।’ আমি আরো পান করলাম। সে সময়ে আমি স্বপ্নের অর্থ বুঝিনি। কিন্তু যখন আমি কাদিয়ান এলাম তখন বুঝতে পেরেছি, স্বপ্নে আমি যে সম্মানিত ব্যক্তিকে দেখেছি তিনি হচ্ছেন মৌলভী নূরউদ্দীন। অনেক সময় শিক্ষা লাভের জন্য আমি সারারাত তার সাথে বসে থাকতাম কিন্তু তিনি কখনও বিরক্ত হতেন না।

যারা তাঁর প্রাত্যহিক কুরআন ক্লাসে বসতেন তাদের অনেকেই বিষদ নোটস নিতেন যার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ পরবর্তীতে ছাপা হয়েছে কিন্তু তিনি নিজে কখনও কোন তফসীর ছাপেন নি। তাঁর যুক্তি ছিল, কুরআন আল্লাহ্র কথা, আল্লাহ্ যেমন অসীম তেমনি তাঁর কথাও সীমাহীন। তাই আমরা এর ব্যাখ্যাকে সীমিত কিছু দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে আবদ্ধ করতে পারি না। তিনি আরো বলেন, কুরআন যেহেতু খোদাতা'লার কথা তাই তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করবেন বলে আশা করা যেতে পারতো কিন্তু তিনি তা করেন নি আর হযরত মুহাম্মদ (সা:)-ও তা করেন নি। তাঁর অব্যবহিত পরের উত্তরসূরীরাও তা করতে পারতেন কিন্তু করেন নি। ফিকাহ্র বড়-বড় চারজন ইমাম তথা আবূ হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলদের কেউই কুরআনের তফসীর লিখেন নি। অথচ তাদের প্রথমজনের যুগ হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর যুগ থেকে বেশি দূরের ছিল না এবং তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা:)-এর কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। হাদীস সংকলকদের মধ্যে বুখারী, তিরমিযী, আবূ দাউদের মত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তাদের কেউই কোন তফসীর রচনা করেন নি। সূফীদের মধ্যে হযরত মুহিউদ্দীন চিশতী, হযরত শাহ্ নক্শবন্দী, হযরত আব্দুল কাদের জিলানী প্রমুখ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন যাঁদেরকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের পাশাপাশি বাহ্যিক জ্ঞানও প্রদান করা হয়েছে এসত্ত্বেও তাঁরা কোন তফসীর প্রণয়ন করেন নি। সাহাবউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী একটি তফসীর লিখেছেন কিন্তু এতে মৌলিক কোন বিষয় নেই।

“আমি একটি তফসীর লিখেছি। আমার বন্ধুরা সেটি ছাপানোর জন্য জোর দিলেন। আমি ভাবলাম, যারা আমার পরে আসবে তারা হয়তো ভাববে, এটিই চূড়ান্ত কথা আর এভাবে নিজেদের জন্য কুরআনী সত্য ও প্রজ্ঞার রাস্তা বন্ধ করে রাখবে। এটি খোদার কিতাব যাতে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে আর সকল পরিবেশে এটি আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা। এর কল্যাণরাজিকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, তাই আমি একটি অকূল সমুদ্রকে কলসীতে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করলাম।”

মসীহ্ মাওউদ (আ.) যাকে কুরআনের খিদমতের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে তিনি কোন অনুবাদ বা তফসীর ছাপেন নি। যে সমস্ত অনুবাদ ও তফসীর ছাপা হয়েছে এথেকে মানুষ কিছুটা লাভবান হয়েছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সে সকল তফসীর ও অনুবাদকে শেষ কথা মনে করে এর উপর নির্ভর করে বসে যাবে এবং নিজে চিন্তা করা ছেড়ে দেবে এতে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

“আমি একটি তফসীর লিখেছি। আমার বন্ধুরা সেটি ছাপানোর জন্য জোর দিলেন। আমি ভাবলাম, যারা আমার পরে আসবে তারা হয়তো ভাববে, এটিই চূড়ান্ত কথা আর এভাবে নিজেদের জন্য কুরআনী সত্য ও প্রজ্ঞার রাস্তা বন্ধ করে রাখবে। এটি খোদার কিতাব যাতে সকল যুগের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে আর সকল পরিবেশে এটি আত্মিক ব্যাধির চিকিৎসা। এর কল্যাণরাজিকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, তাই আমি একটি অকূল সমুদ্রকে কলসীতে আবদ্ধ করার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করলাম।”

তাঁর জ্ঞান পিপাসা ছিল অতৃপ্ত। তিনি

একটি বিশাল পাঠাগার গড়ে তুলেন যাতে পান্ডুলিপির আকারে অনেক বিরল বই ছিল। দূর ও নিকট থেকে এসব সংগ্রহ করা হয়েছে বা অনুলিপি করা হয়েছে। একবার তিনি তাঁর এক শিষ্য মৌলভী গোলাম নবীকে শওকানীর তফসীরের একটি অনুলিপি প্রস্তুতের জন্য ভূপাল পাঠান। এটা নবাব সিদ্দীক হাসান খানের পুত্র নূরুল হাসান খানের পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল। ছয় খন্ডের এ বইটি লিখতে মৌলভী গোলাম নবীর পুরো এক বছর লেগে গেছে।

ভূপাল থেকে আসার পর তাঁকে মিশর গিয়ে আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ও মিশরীয় সরকারের গ্রন্থাগার থেকে ইবনে কাইয়্যুমের বই 'শিফাউল আলীল ফি মসায়েলীল কাযায়ে ওয়াল কাদরি ওয়াত্ তাআলীল' এর একটি অনুলিপি করতে বলা হয়। এটি ৮০০ পৃষ্ঠার একটি বই। এর অনুলিপি প্রস্তুত করতে মৌলভী গোলাম নবীর ১৮ মাস লেগে যায়। আর একটি বই যার তিনি অনুলিপি প্রস্তুত করেন তাহলো ইমাম সইয়্যুতির 'হামাআল হওয়ামেহ মাআহু শারাহ জামিউল জওয়ামেহ্' এটি ৭০০ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট একটি বই।

তাঁর পড়াশুনার গন্ডি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি শেকস্পিয়ারের পুরো লেখনীর আরবী অনুবাদ পড়েছেন।

১৯১০ সনের সেপ্টেম্বরে শিক্ষা সম্পর্কে পাঞ্জাব চীফ কোর্টের বিচারপতি শাহ্দিনের এবোটাবাদে প্রদত্ত একটি বক্তৃতা শুনার কথা এখনও এ গ্রন্থ প্রণেতার মনে আছে। তিনি এ মন্তব্যের সাথে সমাপ্ত করেন: "যে মাপকাঠি আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি এর ভিত্তিতে আমার বন্ধু ও পরিচিত মহলের ব্যাপক গন্ডিতে শিক্ষার একমাত্র পরাকাষ্ঠা হলেন কাদিয়ানের মৌলভী হাকীম নূরউদ্দীন।"

১৮৮৪ সনের আগষ্ট মাসে ভাওয়ালপুরের নবাব অসুস্থ হলে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু চাঁচরা শরীফের খাজা গোলাম ফরিদ তাঁকে কাদিয়ান থেকে হাকীম নূরউদ্দীনকে আনার পরামর্শ দেন। লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাঁকে কয়েক দিনের জন্য ভাওয়ালপুর পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে নবাব সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে পত্র লিখেন। তিনি ভাওয়ালপুরে আসেন এবং নবাবের কাজের যতটুকু সম্পর্ক আছে তা শেষ করে কাদিয়ান ফেরত যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। তখন খাজা গোলাম ফরিদ টেলিগ্রামের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছ থেকে আরও কিছুকাল নূরউদ্দীনের জন্য ভূপালে অবস্থানের অনুমতি নেন। তিনি মৌলভী সাহেবকে বললেন, তাঁকে ডাকার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়া আর তাঁর কুরআনের তফসীর শোনা। নবাব সাহেবের অসুস্থতা সে সুযোগ করে দিয়েছে। যেহেতু তিনি ভাওয়ালপুরে, তাই তাঁরা তাঁর কাছ থেকে কিছুটা কুরআন শিখতে আগ্রহী। মৌলভী নূরউদ্দীন ভাওয়ালপুরে কুরআন শিক্ষার ক্লাস আরম্ভ করেন। তাঁর ভাওয়ালপুর অবস্থানের মেয়াদ যখন শেষ হয়ে আসছিল খাজা গোলাম ফরিদ নবাব সাহেবের কাছে প্রস্তাব রাখলেন, নূরউদ্দীনকে ভাওয়ালপুরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তাঁর উৎসাহিত করা উচিত। নবাব তাঁর সমীপে বিষয়টি নিবেদন করেন, যদিও বিষয়টি তাঁর কাছে একান্ত অপছন্দনীয় ছিল কিন্তু তাঁর প্রস্তাবের অসারতা প্রমাণের জন্য নবাবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি আমি আপনার পরিকল্পনার শিকার হই তাহলে আমার জীবিকার কি হবে?'

"আমি আপনাকে ৬০ হাজার একর কৃষি জমি দেবো।"

"তা দিয়ে আমি কি করবো?"

"আপনি তা আবাদ করে একান্ত সম্পদশালী হতে পারেন।"

"আমার বর্তমান অবস্থায় আপনি আমার কাছে পরমার্শ ও দিকনির্দেশনার জন্য আসেন। কিন্তু আমি যখন বড় সম্পদশালী হয়ে যাবো আপনি কি তখনও আমার কাছে আসবেন?"

"তিনি বললেন, 'না' মোটেই নয়।"

"তাহলে আমার কি লাভ হলো?"

জীবনচলার পথে মূল্যবোধের স্থান যে কত উর্ধ্বে সে সম্পর্কে নবাবের কোন ধারণাই ছিল না যা তাঁর জীবনকে পরিচালিত করতো।

১৮৯৬ সনে নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে লিখেন, তিনি কুরআন শিখতে গভীরভাবে আগ্রহী। তিনি যদি পছন্দ করেন তাহলে মৌলভী নূরউদ্দীনকে মালীর কোটলা গিয়ে তাঁকে কুরআন শিখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত করতে পারেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা পেয়ে তিনি মালির কোটলা যান এবং কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেন। প্রথমে শহরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয় পরে শেরওয়ানী কোট-এ নবাব সাহেবের বাড়িতে তিনি স্থানান্তরিত হন। নবাব সাহেব প্রত্যেকদিন তাঁর ক্লাসে যোগ দিতেন এবং দুপুরের খাবার একসাথে খেতেন। তাঁর কয়েকজন ছাত্র তাঁর পিছু-পিছু কাদিয়ান থেকে শেরওয়ানী কোট যায়। নবাব সাহেব তাদের থাকা-খাওয়ার সকল ব্যবস্থা করেন। তাঁর কুরআন পাঠ ছয় মাসে শেষ হয়।

সে সময় মালির কোটলায় ভগত রাম

শাহী নামে একজন চিকিৎসক কর্মরত ছিলেন। তিনি ভেরার অধিবাসী ছিলেন আর কাশ্মীরে কাজ করেছেন। তিনি মৌলভী নূরউদ্দীনকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং মাঝে-মাঝে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বললেন, মালির কোটলা থেকে বাইরে না গিয়েও তিনি মাসে এক হাজার রুপী আয় করেন। মৌলভী সাহেব তাঁকে উত্তর দিলেন, কোথাও না গিয়ে সমপরিমাণ রূপী তিনিও আয় করেন।

পরবর্তীকালে নবাব মোহাম্মদ আলী সাহেবের কাছে এক পত্রে তিনি লেখেন: "কুরআনের এ আয়াতটি ভালভাবে স্মরণ রাখবেন: যে ব্যক্তি খোদার প্রতি দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান আল্লাহ্‌তা'লা কঠিন পরিস্থিতি থেকে তার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এবং এমন স্থান থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যা সে ভাবতেও পারে না (৬৫-৩.৪)। এ বিষয়ে যারা সচেতন আমি তাদের জন্য একান্ত নিবেদিত কিন্তু অধম স্বয়ং ততটা যত্নবান নয়, এ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তার জীবিকার ব্যবস্থা এমন স্থান থেকে করেন যা সে ভাবতেও পারে না। মালির কোটলা অবস্থান কালে আমাকে কোন কোন খাতে খরচ করতে হয়েছে, যে কাজে আমার প্রায় পঁচিশ শ রূপী ব্যয় হয়। এর বেশির ভাগ কোত্থেকে এসেছে আপনি ভাবতেও পারবেন না। কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন এটি কোত্থেকে এসেছে। এমনকি আমার স্ত্রীও জানে না।"

তিনি নিজে কারও সাথে বিতর্কে জড়াতে চাইতেন না কিন্তু যখন তাঁকে কারো মুখোমুখী হতেই হতো, কোন গত্যন্তর থাকত না তখন তিনি আল্লাহ্‌র সাহায্য ও জ্ঞানের জন্য দোয়া করতেন আর সবসময় সঠিক দিকনির্দেশনা পেতেন। একবার লাহোর সফরকালে একজন হিন্দু আইনবিদ তাঁর সাথে দেখা করতে আসে। আসার পুর্বে সে তার বন্ধুদের বলে আসে, সে আজ মৌলভী নূরউদ্দীনকে আত্মার পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে আলোচনায় কোনঠাসা করবে। তাঁর যুক্তি ছিল, মানুষের বহুবিধ অবস্থা ও পরিস্থিতি, বিত্ত ও দারিদ্র, স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্লেশ, বড় ও ছোট, স্বাস্থ্য ও রোগব্যাধি প্রভৃতির শুধু তখনই হিসাব হতে পারে যদি তার এক চক্রের আচার-ব্যবহার পরবর্তী চক্রে তার অবস্থা কেমন হবে তা নিরূপণ করে আর যদি এটি মেনে নেয়া হয় যে আল্লাহ্‌তা'লা বস্তুর উপর কোন নিয়ন্ত্রণ রাখেন না। তার বিষয়টি উপস্থাপনের পুর্বেই মৌলভী সাহেব নিজের পকেট থেকে দুটো রৌপ্য মুদ্রা বের করেন এবং সেগুলোকে আইন ব্যবসায়ীর সামনে রেখে বললেন, আপনি এ দুটোর একটি হাতে নিন। আইনবিদ কোন নড়াচড়া না করে নীরবে বসে মুদ্রা সম্পর্কে প্রায় আধা ঘন্টা কি যেন ভাবছিলেন। এ নাটকীয় নীরবতা উপস্থিত লোকদের আশ্চর্যান্বিত করলো এবং কেউ একজন আইনবিদকে জিজ্ঞেস করলেন, একটি মুদ্রা উঠাতে বাধা কোথায়?

তিনি বললেন, "আমি অদ্ভুত অনিশ্চিৎ পরিস্থিতির সম্মুখীন। যে মুহূর্তে একটি মুদ্রা উঠাবো আমাকে প্রশ্ন করা হবে, আমি কেন অন্যটির উপর এটিকে প্রাধান্য দিলাম? আর তখন আমাকে এ প্রশ্ন করা হবে, যদি একটি মুদ্রাকে অন্যটির উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়ে আমার স্বাধীনতা থাকে তাহলে মানুষের অবস্থায় ব্যাপক বৈচিত্রময়তা সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কি স্বাধীনতা থাকতে পারে না? এ মুহূর্তে আমার কাছে এর কোন উত্তর নেই। আরও ভাবার পর আমি আলোচনায় ফিরে আসবো।" এ ব্যক্তি আর ফিরে আসেনি।

একজন পশ্চিমা খৃষ্টান পাদ্রী ত্রিত্ববাদ সম্পর্কিত আলোচনায় কোনঠাসা হবার পর এই অসম্মানসূচক কথা বলে পালানোর চেষ্টা করে যে এশিয়ান মস্তিষ্ক ত্রিত্ববাদের রহস্য বুঝতে অক্ষম। তাকে তখন এ উত্তর শুনতে হলো: "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। সে কারণেই তো ঈসা, পিতর এবং পল এ বিষয়টি বুঝতে পারেন নি, কারণ তাদের সকলেই এশিয়ান ছিলেন।"

একজন খৃষ্টান পাদ্রী তাঁর 'কুরআন ডিসপেনসেবল' (অপ্রয়োজনীয় কুরআন) বইটি মৌলভী নূরউদ্দীনকে উপহার দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়তে বললেন। এর বিষয়বস্তু হলো, কুরআন ঐশীবাণী নয় বরং আরবী ভাষায় রচিত বহু মতবাদ ও শিক্ষার সমবেত রূপ যা পূর্বের বিভিন্ন ঐশী গ্রন্থ যেমন, তাওরাত, ইঞ্জিল, বেদ ও যিন্দাবেস্তা ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত। লেখক কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত বেছে নিয়ে প্রত্যেকটির, এ গ্রন্থগুলোর কোন না কোনটির সাথে সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করেছে। বইটি পড়তে মৌলভী সাহেব বেশি সময় নেন নি। তিনি নিম্নোক্ত মন্তব্যের সাথে বইটি লেখককে ফেরত দিয়েছেন: "আপনার বইটি পড়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এটি পড়ে আমার ঈমান ও বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে কুরআন সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্‌র বাণী। অগণিত ভাষা যেমন: সংস্কৃত, হিব্রু, এরামিক এবং পালী ইত্যাদি ভাষায় বিভিন্ন বই সংগ্রহ ও পড়া (বলা হয় শুধু বেদ পড়তে চল্লিশ বছর লাগে) আর সে সব গ্রন্থে যে সব সত্য অন্তর্নিহিত রয়েছে তা আয়ত্ত করা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন নিরক্ষর আরবের জন্য নিঃসন্দেহে সাধ্যাতীত বিষয় ছিল। তাছাড়া কুরআন করীমই একমাত্র গ্রন্থ যা সুমহান সত্যের অন্তর্নিহিত দর্শন বর্ণনা

করে আর যুক্তি ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সংহতি দেখিয়ে থাকে। কুরআন আগমনের পূর্বে রাজা বাদশাহ্‌রা জোর জবরদস্তি করে প্রজাদের উপর তাদের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী চাপাতো। ধর্মীয় নেতারা সাধারণ মানুষকে ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের কৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার অনুমতি দিত না। ধর্ম গুরুরা ছাত্রদের কোন প্রকার স্বাধীনতাকে সহ্য করত না। কুরআন নিম্নবর্ণিত শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতার একটি নব যুগের সূচনা করেছে এই বলে, তোমরা কেন যুক্তি খাটাও না, তোমরা কেন চিন্তা কর না। তারা কুরআন নিয়ে কেন ভাবে না ?"

একজন প্রবীণ দার্শনিক যিনি সবকিছু বিশ্লেষণ করা ভালবাসতেন। তিনি সবার কাছে কোন না কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে অভ্যস্ত ছিলেন, যে উত্তরই দেয়া হতো তিনি তা বিশ্লেষণ করে এর ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন আর এভাবে মানুষকে তার ব্যাপক পান্ডিত্য মানাতেন। একবার তিনি মৌলভী নূরউদ্দীনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রজ্ঞা কি?' তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রজ্ঞা হলো সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা, শির্ক থেকে আরম্ভ করে সামান্যতম অভদ্রতাও এর অন্তর্ভুক্ত।' দার্শনিক উত্তর শুনে হতভম্ভ হয়ে গেল এবং জিজ্ঞেস করল, 'আপনার উত্তরের প্রমাণ কি?' কুরআনের একজন হাফেয যিনি ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত ছিলেন মৌলভী সাহেব তাঁর দিকে ফিরে বললেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক দার্শনিক সাহেবের জন্য পবিত্র কুরআনের ১৭ নং সুরার ৪ এবং ৫ নং আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত ও অনুবাদ করুন? হাফেয সাহেব এটা করেছেন এবং এর অনুবাদ নিম্নরূপ: ''এবং তোমার প্রভু তাকিদপূর্ণ এ আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদের উভয়কে তুমি উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দিও না বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলো। তাদের সাথে বিনয়াবনত কোমল আচরণ করো এবং দোয়া করো, হে আমার প্রতিপ্রালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে দয়াপরবশ হও যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিল। তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে তোমাদের প্রতিপালক তা সর্বাধিক অবগত আছেন। যদি তোমরা সৎকর্মপরায়ণ হও তাহলে স্মরণ রেখো যারা বার বার আল্লাহর নিকট বিনত হয় নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অতি ক্ষমাশীল। আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও একইভাবে মিসকীন ও পথচারীগণকেও। এবং কোন প্রকার অপব্যয় করো না, নিশ্চয় অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই এবং শয়তান প্রভুর প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। যদি তোমার প্রভুর রহমত লাভের প্রত্যাশায় তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো। তুমি কৃপণতাবশত তোমার হাত সম্পূর্ণভাবে গুটিয়ে নিও না নতুবা তুমি নিন্দিত, ক্লান্ত হয়ে বসে যাবে এবং তা সম্পূর্ণরূপে প্রসারিতও করো না তাহলে শূন্য হাত হয়ে তুমি সদকা নির্ভর হয়ে যাবে। নিশ্চয় তোমার প্রভু যার জন্য চান জীবিকা সম্প্রসারিত করেন এবং যার জন্য পছন্দ করেন তা সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাগণ সম্পর্কে সম্যক অবগত ও সর্বদ্রষ্টা। দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানগকে হত্যা করো না। আমরাই তাদের রিয্ক দিয়ে থাকি আর তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট পন্থা। কোন প্রাণ যাকে আল্লাহ্ পবিত্র আখ্যা দিয়েছেন তাকে বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করবে না। যে ব্যক্তি নির্যাতিত অবস্থায় নিহত হয় অবশ্যই আমরা তার উত্তরাধিকারীকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছি কিন্তু সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমালংঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। এতীম যতদিন প্রাপ্ত বয়সে উপনীত না হয় ততদিন সবচয়ে কল্যাণজনক কারণ ছাড়া তার সম্পত্তির কাছেও যাবে না আর তোমরা অঙ্গীকার রক্ষা করো। কেননা অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যখন তোমরা মেপে দাও পুরোপুরি দাও, সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে দাও। পরিণামের দিকে থেকে এটি কল্যাণজনক ও সর্বোত্তম। এবং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই এর পশ্চাদানুসরণ করো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়ের প্রত্যেকটিকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলো না কারণ তুমি কখনও ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং আর যারা সবচেয়ে উঁচু পদমর্যাদার অধিকারী তুমি কখনও তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এ সবকিছুর মন্দ বহিঃ প্রকাশ তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে অতি ঘৃণ্য। এটি সে প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত যা তোমার প্রভু তোমার প্রতি ওহী করেছেন; এবং তুমি তোমার প্রভুর সাথে কোন উপাস্য স্থির করো না অন্যথায় তুমি বিতাড়িত ও তিরস্কৃত হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (১৭:২৪-৪০)।"

উত্তর শুনে দার্শনিক সাহেব একেবারে নির্বাক হয়ে যান।

[পুস্তক ঃ "হযরত মৌলভী নূরউদ্দীন (রা.)" বাংলা সংস্করণ পৃঃ ৯২-১০৫]

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর অসাধারণ কর্মময় জীবনের এক ঝলক

সে বৃদ্ধি লাভ করবে। এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে

খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.)

খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৮৮৯ সালের ১২ ইং জানুয়ারী কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন।

হুযূর (রা.) ১৯১৪ সনের ১৪ইং মার্চ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে মাত্র সতের বছর বয়সে সর্বপ্রথম কাদিয়ানে সালানা জলসায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল **‘শির্কের মুলোৎপাটন’**। হুযূর (রা.) ধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে ইসলামের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রথম ১৯২৪ সনে লন্ডনে যান। এ উপলক্ষে তিনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম (Ahmadiyyat or true Islam) এ শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.)।

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, “পরম কারুনিক পরমদাতা মহিমান্বিত খোদা যিনি সর্ব শক্তিমান” যার মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলেন ঃ “আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চেয়েছো তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি! সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হয়েছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো।

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মুসলেহ মাওউদ -এর অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী ঃ

“সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসতেছে। তার নাম ইন্মানুয়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে...। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে কালেমাতুল্লাহ্-আল্লাহর বাণী। কারণ খোদার দয়া সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়পুত্র।

“মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলা কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে” অর্থাৎ সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও

প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে জ্যোতিঃ খোদা তাকে তার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ ফুঁৎকার করে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া (অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মীমাংসা)। (ইশতেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ-ও ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্ম লাভ করবেন। এরপর এই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবার' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তার জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে এটি প্রকাশ করেন যে, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই।

১৯৪৪ ইং সনের ৪-৫ জানুয়ারী মধ্যবর্তী রাতে লাহোরস্থ মোকাররম শেখ বশীর আহমদ সাহেবের বাসায় রাত্রি যাপন কালে এই প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, যিনি তখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খিলাফতে আসীন, এক মহান রুইয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তিনিই মুসলেহ মাওউদ। পরবর্তীতে ২৮শে জানুয়ারীতে কাদিয়ানের মসজিদে জুমুআর খুতবায় এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হুশিয়ারপুর শহরে জলসা করে মুসলেহ মাওউদ হওয়ার দাবীর জোরদার ঘোষণা করেন। দিল্লী শহরেও সাধারণ মিটিং করে অনুরূপ ঘোষণা দেন।

আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চেয়েছো তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি! সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হয়েছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো।

মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর যে সকল গুণাবলী ও কার্যাবলী উল্লেখিত হয়েছে পরবর্তীতে তাঁর খিলাফত কালে সেগুলো সমুজ্জ্বলভাবে পূর্ণ হতে দেখা যায়। তাঁর এ সুদীর্ঘ খিলাফতকালে প্রতিটি আগত দিন জামা'তের জন্য কোননা কোন উন্নতি ও আশার বাণী নিয়ে আসত।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর মহান কার্যাবলীর কিছু ঝলক ঃ

প্রকাশনা জগতে অবদান ঃ

হযরত মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে যে, **"জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে পরিপূর্ণ করা হবে।"** তাঁর জীবদ্দশায় কুরআনের অমূল্য তফসীর গ্রন্থ ও বহু পুস্তক পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে ইসলামের মহান সেবার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত বাক্যাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে। ১৯০৬ সনে তিনি মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'তাশহিযুল আযহান' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯১৩ সালে সাপ্তাহিক আল ফযল প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সনে কুরআনের প্রথম পারা উর্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। সুবিখ্যাত তফসীরে কবীরসহ শত শত পুস্তক-পুস্তিকা এবং অনেক খুতবা, বক্তৃতা, ভাষণও মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) শুধু মাত্র কুরআনের তফসীর গ্রন্থ 'তফসীরে কবীর' ও 'তফসীরে সগীর' রচনা করে ইসলামের সেবায় যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা-ই তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজে ঘোষণা করেছেন, আমাকে এ যুগে খোদা তাআলা স্বয়ং কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর আমি ব্যতীত দুনিয়াতে বর্তমানে আর কাউকেই খোদা তাআলা কুরআনের এমন তত্ত্বজ্ঞান দান করেন নি। আর আমি সমস্ত দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা বর্ণনায় কেউ আমার মোকাবেলা করুক।

কুরআনের তফসীর ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য কিছু পুস্তক হচ্ছে ঃ ১। যিকরে ইলাহী ২। ইরফানে ইলাহী ৩। তকদীরে বিল্লাহ ৪। নবীওঁকা সরদার ৫। মালায়েকাতুল্লাহ্ ৬। নাজাত ৭। মিনহাজুত তালেবীন ৮। দুনিয়াকা মুহসীন, ৯। Introduction to the study of the Holy Quran ১০। Ahmad the messenger of the latter days ১১। Invitation to Ahmadiyyat ১২। what is Ahmadiyyat? ১৩। The new world order of Islam................. ইত্যাদি।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯১৪ সনে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে খিলাফতে আসীন হয়ে বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করতে থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (রা.)-এর উপর অবতীর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল **"ম্যাঁয় তেরে তবলীগকো দুনিয়াকে কিনারো তক পহচাঁউঙ্গা"** অর্থাৎ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগান্তকারী পদক্ষেপ সমূহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। এক এক করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করতে থাকেন। আজ আমরা সেই বীজগুলোকে বিশাল বৃক্ষরূপে দেখছি।

১৯৫১ ইং সনে তিনি কাযী আব্দুল্লাহ সাহেবকে মোবাল্লেগ হিসেবে লন্ডন প্রেরণ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাদেক এবং আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেবদ্বয় যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম আফ্রিকায় মিশনারী হিসাবে প্রেরিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি (রা.) মৌলভী মোবারক আলী (বাঙ্গালী) এবং মালিক গোলাম ফরিদকে বার্লিনে প্রেরণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর খলীফাতুল মসীহ সানী ও মুসলেহ মাওউদ (রা.) লন্ডন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৩৪-৩৮ সনের মধ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, ইতালি এবং আলবেনিয়ায় মিশন স্থাপন করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোতে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করেন আর সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের প্রচারের দরজা খুলে যায়।

১৯১৩ ইং সালের জুলাই মাসে হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবকে প্রথম মুবাল্লেগ হিসেবে ইংল্যান্ডে পাঠান। সেপ্টেম্বর ১৯১২ ইং সনে হযরত খাজা কামাল উদ্দীন উকিল সাহেব নিজ ব্যবস্থায় লন্ডন যান। যদিও তিনি নিজ উদ্যোগে গিয়েছিলেন তবুও প্রথম-প্রথম তাকে জামা'তের প্রতিনিধি মনে করা হয়েছে। পরে তার কর্মকান্ডের ও বক্তব্যের কারণে আর দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়আত না করার ফলে জামা'তের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাছাড়া ১৯১৪ ইং সনে তিনি দেশে ফেরত এসে মৌলভী মোহাম্মদ আলীর দলে শামীল হন।

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে "সে পৃথিবীতে আসবে এবং তাঁর সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করিবে।" এছাড়া আরও উল্লেখ আছে, "সে বৃদ্ধি লাভ করবে। এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে।"

১৯১৫ ইং সনের ৪ সেপ্টেম্বর হযরত কাজী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বি.এ,বিটি সাহেব লন্ডন যাত্রা করেন। ১৯১৫ ইং সালে হযরত সূফী হাফেয গোলাম মোহাম্মদ সাহেব প্রথমে কলম্বো, তারপর শ্রীলংকায় গিয়ে জামা'ত কায়েম করেন। এখানে তিন মাস অবস্থান করার পরে তিনি মরিশাস যাত্রা করেন। ১৯১৭ ইং সালের ১৭ এপ্রিল হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব প্রথমে লন্ডন গিয়ে তবলীগের কাজ করতে থাকেন। তারপর ১৯২০ সনে আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি আমেরিকার প্রথম মুবাল্লেগ ছিলেন। তারপর ১৯১৯ ইং সনে হযরত মৌলভী আব্দুর রহিম নাইয়ার সাহেব প্রথমে লন্ডনে ও পরে ১৯২১ ইং সনে নাইজেরিয়া যাত্রা করেন। ১৯২০ ইং সনে মৌলভী মুবারক আলী খান সাহেব বাঙ্গালী প্রথমে লন্ডন যান। তারপর ১৯২১ ইং সনে সেখান থেকে বার্লিন, জার্মানী যাত্রা করেন। তিনি জার্মানীর প্রথম মুবাল্লেগ ছিলেন। তিনি দু'বছর পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য জনাব মালেক গোলাম ফরিদ সাহেবকে কাদিয়ান থেকে জার্মানীতে পাঠানো হয়। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলে মৌলভী মোবারক আলী ১৯২৪ ইং সনে মিসর প্রেরিত হন। এভাবে দ্রুত গতিতে তবলীগের কাজ চলতে থাকে। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ম খণ্ড-পৃ : ১৬৪)

মোটকথা, দেশের ভিতর ও বাইরে

চতুর্দিকে মুরুব্বী ও মুবাল্লেগণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে যেতে থাকেন এবং তবলীগের কাজ চলতে থাকে।

১৯৩৪ ইং সনে 'মজলিসে আহরারে ইসলাম' মোল্লাদের সংগঠন ঘোষণা করে যে, কাদিয়ানের ইট পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু মুসলেহ মাওউদ (রা.) এতে কোন ভয় পেলেন না বরং আরো প্রবল বেগে জামা'তের প্রচার প্রসার বাড়িয়ে দিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আল্লাহর ইশারায় তাহরিকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করলেন, যা বিদেশে মসজিদ নির্মাণ, মিশন প্রতিষ্ঠা, মুবাল্লেগ প্রেরণ ও ইসলাম প্রচারের বিশাল কর্মকান্ড দেখা শোনা করবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদীদেরকেই যে শুধু সাংগঠনিকভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন তা নয়। জামা'তের বাইরেও তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার ছাপ পড়েছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলো–

(১) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ই কাশ্মিরের জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের সংগঠন, 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মির কমিটি' গঠন করেন। এবং ১৯৩১ সনে তিনি এর সভাপতিও ছিলেন।

(২) ভারতের স্বাধীনতার সপক্ষেও তিনি অবদান রেখেছেন, খুতবা প্রদান করেছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সম্বোধন করে বলেছেন– '২৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে। আর আজ তারা তোমাদের কাছে তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা চাচ্ছে। তোমাদের উচিত তাদের এ দাবীকে মানা।' তাঁর এ বক্তব্যকেই পরবর্তীতে চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব যিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড ওয়াবেল গঠিত 'ভারতীয় স্বাধীনতা কমিশনের' প্রধান ছিলেন। তিনি তার হাউজ অব লর্ড এর ভাষণে মুসলেহ মাওউদ (রা.) বক্তব্যই প্রতিধ্বনিত করেন। এবং অল ইন্ডিয়া রেডিও তা সম্প্রচারও করে।

> ***"সে পৃথিবীতে আসবে এবং তাঁর সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করিবে।" এছাড়া আরও উল্লেখ আছে, "সে বৃদ্ধি লাভ করবে। এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে।"***

(৩) পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। কায়েদে আযম, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উপমহাদেশের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান, তখন মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে লন্ডন মসজিদের ইমাম তাকে বুঝান এবং আবার পাকিস্তান আন্দোলনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

(৪) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছিলেন। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি ফিলিস্তিনীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাও তারা শুনেনি। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে আবার মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তা তারা শুনেনি। ফলে আজ তাদের এ দুরাবস্থা।

(৫) দেশ বিভাগের সময় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কে পন্ডিত নেহেরু প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, "আপনি ভারতে থাকেন, আমি আপনাকে ভ্যাটিকানের মত স্বাধীন রাষ্ট্র বানিয়ে দিব।" কিন্তু রাজনৈতিক নেতার মুখের আশ্বাস আর প্রলোভনে মুগ্ধ না হয়ে, তিনি পাকিস্তানে হিজরত করে আহমদী অধ্যুষিত, সুগঠিত, সুপরিকল্পিত আধুনিক শহর রাবওয়াহ্ গড়ে তুলেন। এটি তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শীতাকেই প্রমাণ করে।

এখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের আরেকটি দিক তবলীগের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু শুরুতেই প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এ বিরোধিতা জামা'তের ভিতর বাইর উভয় দিক থেকেই হয়েছিল। জামা'তের একটা বিশেষ অংশ মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের নেতৃত্বে, যাদেরকে লাহোরী জামা'ত, বলা হয় তারা তাঁর খিলাফতকে অস্বীকার করে এবং জামা'ত থেকে পৃথক হয়ে যায়। ফলে মুসলেহ মাওউদ (রা.)-কে

একদিকে লাহোরী জামা'ত, অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মুখালেফাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে– আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছানোর কাজ করতে হয়েছে। আর পৃথিবীর ইতিহাস আজ সাক্ষী তিনি আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ ও ফযলে অত্যন্ত যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছেন। যার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। (১) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ১৯১৪ সনে ইংল্যান্ডে তবলীগী কেন্দ্র চালু হয়। এবং ১৯২৪ সনে লন্ডন ফযল মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সেই মসজিদেই হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৫ সালে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে, ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯২১ সালে সিয়েরালিওন, ঘানা, নাইজেরিয়া ও বুখারাতে তবলীগি কেন্দ্র চালু হয়।

এছাড়াও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ই ভারতের উত্তর প্রদেশের হিন্দুরা ১৯২২ সালে যখন "শুদ্ধি" আন্দোলনের নাম দিয়ে মুসলমানদেরকে বল পূর্বক হিন্দু বানাচ্ছিল, তখন তিনি তা প্রতিরোধ করেন। জিহাদের ডাক দেন। আহমদী যুবকদেরকে তবলীগের জন্য সেখানে পাঠান। তাদের তবলীগে ধর্মত্যাগীরা ফিরে আসে এবং হিন্দুরা সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

জামা'তের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানঃ জামা'তের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা ও কর্মকান্ড সমূহকে বেগবান করার লক্ষ্যে মুসলেহ মাওউদ (রা.) জামা'তকে কয়েকটি অংগসংগঠনে বিভক্ত করেন। ১৯২২ ইং সনে পনের উর্দ্ধ মহিলাদের অঙ্গসংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৮ ইং সনের ১৩ ই জানুয়ারী আহমদী যুবকদের জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া ১৯৪০ ইং সনের ২৬শে জুলাই চল্লিশোর্ধ পুরুষদের অঙ্গসংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহ গঠন করেন। এই অঙ্গসংগঠনগুলো মূল জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। জামা'তের সদস্যগণ নিজ নিজ অঙ্গসংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে পূর্ণ উদ্দমে কাজ করার ফলে জামা'তীয় কর্মকান্ড অনেক বেগবান হয়েছে।

আবার ১৯৩৪ সনে শত্রুরা আহমদীয়া জামা'তকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে যে তারা কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নিবে, ধুলিস্যাত করে দিবে কাদিয়ানকে। এতদুদ্দেশ্যে তারা জনগণকে উস্কে দিয়ে কাদিয়ান অভিমুখে মিছিল বের করে। আহরার গ্রুপ যখন চরম বিরোধিতায় লিপ্ত তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ঘোষণা দেন, "আহরারীরা অচিরেই তাদের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবে না।"

তখন তিনি (রা.) জামা'তের কার্যক্রমকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য সদস্যদের নিকট তাহরীকে জাদীদ এর ঘোষণা করেন। খলীফার এই ঘোষণায় জামা'তের 'বায়তুল মাল' দ্রুত বৃদ্ধি পায় আর যুবকেরা দলে দলে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ইসলাম সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার তিনি (রা.) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের গ্রাম পর্যায়ে তবলীগ করার লক্ষ্যে ওয়াকফে জাদীদ এর ঘোষণা করেন। বর্তমানে এটি সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে।

আবার ১৯৪৭ ইং সনে ভারত বিভাগের সময় জামা'তের কেন্দ্র 'কাদিয়ান' ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় জামা'তের অধিকাংশ সদস্যকে কাদিয়ানের বাড়ি ঘর ও সহায় সম্পত্তি ছেড়ে পাকিস্তান হিজরত করতে হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর নেতৃত্বে জামা'ত কাদিয়ান থেকে হিজরত করে পাঞ্জাবের পশ্চিমে রাবওয়ায় একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করে। এ জায়গাটি পূর্বে বসবাসের অযোগ্য ছিল। গাছপালা ছিল না। পানি পাওয়াও দুস্কর ছিল। তিনি (রা.) সরকারের নিকট থেকে এ স্থানটি ক্রয় করে রাবওয়া নামকরণ করেন।

আবার ১৯৫২-৫৩ সালে বিরুদ্ধবাদীদের উস্কানীতে পাঞ্জাবে দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দৃঢ়তার সাথে উদ্ভুত এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) -এর সুদীর্ঘ বায়ান্ন বৎসর খেলাফতকালে জামা'ত অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। জামা'ত একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রচার দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায়। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তাআলার এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে

মোমেনদের হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়তর হয়। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল, "সোমবার শুভ সোমবার"। সে অনুযায়ী মুসলেহ মাওউদ (রা.) এক শুভ সোমবার এই ধরাধামে আসেন আর এক শুভ সোমবার ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর এই দুনিয়া ছেড়ে খোদা তাআলার সান্নিধ্যে চলে যান।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৬ ইং তারিখে জলসা সালানা বক্তৃতার মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) খিলাফতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। "নেযামে আসমানী কি মুখালেফাত আওর উস্কা পাসে মনযর" নামে বই আকারে ঐ বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা তৃতীয় খলীফার নির্বাচনের সময় নিজেদের পছন্দমত ব্যক্তিকে খলীফা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরেরদিন ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ ইং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ঐ জলসায় আর একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা "খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া" নামে বই আকারে প্রকাশিত আছে। এতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) পরবর্তীতে খলীফা নির্বাচনের জন্য একটা নীতিমালা বা সংবিধান রচনা করে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে মজলিস শুরার অধিবেশনে তা পাশ হয়ে জামা'তের সংবিধান আকারে গৃহীত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এখানে একটি খলীফা নির্বাচনকারী কমিটি প্রস্তাব করেন। ঐ কমিটিকে 'মজলিসে ইনতেখাবে খিলাফত' বলা হয়েছে। পরবর্তীতে তৃতীয় খলীফার নির্বাচনে হুবহু এ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় এবং ঐ মজলিসে ইনতেখাবে খিলাফতের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর চতুর্থ ও পঞ্চম খলীফার নির্বাচনের সময়ও ঐ নীতিমালা এবং ঐ মজলিসে ইনতেখাবের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই বক্তৃতায় হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজেকে রূহানী ভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর অনুরূপ বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, হযরত ওমর (রা.) জীবনের শেষ দিকে বিভিন্ন লোকের কথাবার্তার কারণে সিদ্ধান্ত নেন যে, ভবিষ্যতে একটি কমিটি খলীফা নির্বাচন করবে। অতীতে কোন কমিটি বা মজলিস খলীফার নির্বাচন করেনি, সবাই মিলে অনাড়ম্বরভাবে খলীফার নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে যেহেতু একদল লোক খিলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে অতএব, সর্ব সাধারণের মাঝে নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যতে মজলিসে ইনতেখাবের সদস্যবৃন্দ খলীফার নির্বাচন করবেন অর্থাৎ কমিটি বা নির্বাচকমন্ডলী খলীফা নির্বাচন করবে। হযরত ওমর (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর একজন বিশেষ মর্যাদার সাহাবী এবং ইসলামের ইতিহাসের একজন অসাধারণ (সকল বিতর্কের উর্ধ্বে) খলীফা ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে খলীফা নির্বাচনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের জন্য কমিটি করে দিয়েছিলেন এবং ঐ কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ হযরত উসমান (রা.)-কে তৃতীয় এবং তারপর হযরত আলী (রা.)-কে চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত করেছিলেন। ঐ সুন্নত অনুসরণ করে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদীয়া খিলাফতের নির্বাচনের জন্য এক কমিটি গঠন করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যেমন ঐ সময় সকল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দু' একজনের প্রস্তাব অনুসারে সকলের সম্মিলিত সমর্থনে খলীফা হয়েছিলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে হযরত হেকীম মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) সেভাবেই প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ও সেই ভাবেই সর্বসাধারণের জোরালো সমর্থনে খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর মনোনয়ন অনুসারে সকলের সমর্থনে খলীফা হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) যেমন পরবর্তীকালের জন্য 'নির্বাচন কমিটি' বানিয়ে দিয়েছিলেন এখানেও তেমনি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নির্বাচনের জন্য মজলিসে ইনতেখাবে খিলাফত কায়েম করে দিয়ে গেছেন।

১৯৬৫ সালের ৭ই নভেম্বর সোমবার দিবাগত রাতে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর পরম প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন। আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে তাঁর দারাজাত বুলন্দ করুন।

আল্লাহ্ তাআলা এই মহান খলীফার আশিসময় ধারাকে আমাদের মাঝে চির প্রবহমান রাখুন।

সংকলনঃ এম,আহমদ

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বাংলাদেশ সফর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

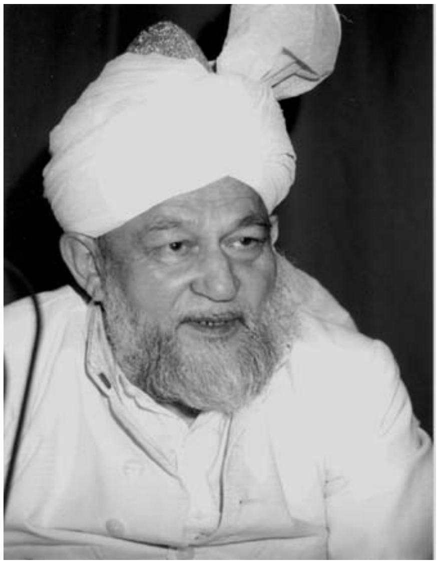

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

বাংলার মাটিতে এমন মহাপুরুষের পদধূলী পড়েছে– যিনি এ দেশের শহর থেকে গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ, সোনার বাংলার মাটি ও মানুষের জীবন যাত্রা, সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং প্রাকৃতিক মহোনীয় অপরূপ দৃশ্যপট মন ভরে অবলোকন করেছেন এবং যার হৃদয় ঐশী খিলাফতের মসনদ হতে প্রৌঢ়ত্বের মাঝেও এদেশে আসার আশায় বিগলিত ছিল– তিনি হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(গত সংখ্যার পর)

অতঃপর ৬ মে ১৯১০ সালে বৃটিশ সম্রাট সপ্তম এ্যাডওয়ার্ড লন্ডনে আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র পঞ্চম জর্জ বৃটিশ সিংহাসনে আরোহন করেন। পরবর্তীতে পঞ্চম জর্জ রাজামাতা রানী মেরী ১৯১১ সালে ভারত সফরে আসেন। তখন দিল্লীতে জাঁকজমকপূর্ণ এক রাজকীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান নওয়াব, রাজা মহারাজা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম জর্জ এ শাহী দরবারে ১১ ডিসেম্বর ১৯১১ খ্রীঃ তারিখে অপ্রত্যাশিত ভাবে বঙ্গভঙ্গের আদেশ রহিত করার ফরমান জারি করেন। ফলে বাঙালিদের মনের কষ্ট দুরীভূত হয়। সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণাঙ্গভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। এবং 'তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে' মর্মার্থে বাঙালিদের দীল জয়ের প্রবাহমান ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং তা বিভিন্নভাবে হয়।

ফলে শতবর্ষ ধরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বংশোদ্ভূত অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি, বিশিষ্ট সাহাবী ও বড় বড় বুযুর্গ আলেমের বঙ্গদেশের মাটিতে শুভাগমন হয়। আহমদীয়তের আকাশে উদিত সে সব তারকারাজির বিকশিত জ্যোতিতে বাংলার মাটি আলোকিত হয়েছে। তাদের পদচারণে ক্ষণে-ক্ষণে নূরের পরশে রূহানীয়াতের বাগান পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। ফলে অনেকে আল্লাহ্ তাআলার হেদায়াত লাভে ঐশী পথের দিশায় ইহজীবনকে সার্থক ও সফল করতে সক্ষম হন। পবিত্র ভূমি কাদিয়ান ও রাবওয়া থেকে আগত সে সব পুণ্যবান ও মহীয়ান আশেকে মসীহ্দের মধ্যে দু'জন মহান ব্যক্তি আছেন যারা পরবর্তীকালে খিলাফতের মসনদে আসীন হয়ে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়তের প্রচার ও প্রসারে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। বিশ্বের শত-কোটি মানুষের মনজয়ে আহমদীয়তের প্রতিশ্রুত বিশ্বজয়ের প্রবাহমান ধারায় দুর্বার গতি সঞ্চালন করেন। ধর্ম জগতের আকাশে উদিত চন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত সেই মহাপুরুষগণ হলেন (১) হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এবং (২) হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)। বাংলাদেশে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে) বিভিন্ন জামা'ত সফরে তাঁরা বাংলার মাটিতে আগুনের পরশমণি জ্বালিয়েছেন। অশান্ত দেশকে শান্তির আবাসনে পরিণত করার শান্তিময় বার্তা প্রচার করেছেন। তাদের দোয়া ও মমতাময়ী ভালবাসায় এদেশের আহমদীরা সিক্ত হন। বাঙালি আহমদীদের হৃদয় উজার করা ভক্তিশ্রদ্ধা ও আতিথেতায় তাঁরাও অভিভূত হন। ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিংবদন্তী হয়ে আছে এ মহিমান্বিত ব্যক্তিদের ঐতিহাসিক সফরের বিজয়গাঁথা ভ্রমণ কাহিনী। সোনাঝরা দিনের হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর সেই স্বর্ণালী অধ্যায়গুলি আলোকপাত করা হলো–

বাংলার মাটিতে এমন মহাপুরুষের পদধূলী পড়েছে– যিনি এ দেশের শহর থেকে গ্রামগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ, সোনার বাংলার মাটি ও

মানুষের জীবন যাত্রা, সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং প্রাকৃতিক মহোনীয় অপরূপ দৃশ্যপট মন ভরে অবলোকন করেছেন এবং যার হৃদয় ঐশী খিলাফতের মসনদ হতে প্রৌঢ়ত্বের মাঝেও এদেশে আসার আশায় বিগলিত ছিল– তিনি হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)। বাঙালি আহমদীদের প্রাণপুরুষ, হৃদয়ের মানুষ। বিশ্বমানবতার শান্তির দূত, অবক্ষয় মুক্ত বিশ্ব গড়ার খোদার মনোনীত লড়াকু সেনাপতি ও অতন্দ্র প্রহরী। রূহানীয়তের অম্লকাননে পরিস্ফুটিত একটি সৌরভিত গোলাপ। আধ্যাত্মিক জগতে উদিত চন্দ্রের স্থলাভিষিক্ত বিশ্বময় আলো বিকিরণের এক মহান বাদশা।

বঙ্গভূমিতে যখনই তাঁর শুভাগমন হয় তখনই তিনি এদেশের বড় বড় জামা'ত থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক আহমদীদের বাড়ী গিয়েছেন। এদেশের নিরক্ষর সাধারণ কৃষককে আপন করে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করেছেন। তিনি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) পুত্র, ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নিরহংকারী আত্মঅহমিকা বিহীন এক অপূর্ব মহানুভবতার আদর্শ মানুষ ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ওয়াক্‌ফে জাদীদের তাহরিক ঘোষণার পর সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব সবার আগে লাব্বায়েক বলেন। ফলে চাঁদা ওয়াদাকারীদের বর্ণিত তালিকায় এক নম্বরে তাঁর নামটি অলংকৃত হয়। পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত জামা'তে আহমদীয়ার সদস্যদের প্রধানত আভ্যন্তরীণ তালিম ও তরবিয়তের উদ্দেশ্যে এ তাহরিক করা হয়। ১৯৫৮ সাল থেকে এ ঐশী কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্মবীর মির্যা তাহের আহমদ সাহেবকে এর নাযেম নিযুক্ত করেন। ফলে নাযেম ইরশাদ ওয়াক্‌ফে জাদীদের গুরুদায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়ে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশে) শুভাগমন হয়। সম্ভবত এদেশে এটাই তাঁর প্রথম সফর। তখন ঢাকার দারুত তবলীগে ২০-২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪০তম সালানা জলসা। এ জলসায় তাঁর পদচারণা কর্মসূচীকে আরো আনন্দঘন, প্রাণবন্ত ও সরগম করে তোলে। হাস্যোজ্জ্বল নূরানী চেহারার সুদর্শন সুপুরুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র সবার দৃষ্টি নন্দিত হয়। তাঁর সাথে মুলাকাতে সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। মহানুভব বিনয়ী মানুষটি প্রাণ খুলে কথা বলেন এবং সবার সাথে আলিঙ্গন করেন। জলসার অধিবেশনে তাঁর সভাপতির আসন অলংকরণ এবং ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত ভাষণ সকলকে মোহিত করে তোলে। তিনি জামা'তে আহমদীয়ার নব তাহরিক ওয়াকফে জাদীদের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে ভাষণ দেন। বাঙালি যুবকদের ইসলামের সেবায় জিন্দেগী ওয়াকফ এবং ওয়াকফে জাদীদের ফান্ডে সকলকে চাঁদা প্রদানের আহ্বান জানান।

কর্মসূচী অনুসারে জলসা সার্থক ও সফলভাবে সম্পন্নের পর ২২ ফেব্রুয়ারি বাদ মাগরিব থেকে মজলিসে শূরার অধিবেশন হয়। সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব মহান বুযুর্গ মির্যা তাহের আহমদ সাহেব শূরার কর্মসূচীর সফলতায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নব গঠিত আমেলায় নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়– ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ। এবং এ পদের দায়িত্ব অর্পিত হয় মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের ওপর। অতঃপর সাহেবযাদা মির্যা সাহেব বাংলার মাটিতে ঐশী নূরের পরশ বিকিরণ করে ঢাকা থেকে রাবওয়া ফিরে যান। তখন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর ছিলেন শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব।

বাঙালি আহমদীদের ভালবাসায় সিক্ত এবং জামা'তের কাজে ফানাফিল্লাহ্ ব্যক্তিত্ব সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব পরবর্তী বছর ১৯৬০ সালে পুনরায় এদেশে শুভাগমন করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ রাতে বিমানযোগে ঢাকার মাটিতে তিনি অবতরণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ ও আহমদনগর জামা'তের প্রেসিডেন্ট মৌলভী মোহম্মদ সাহেবের আমন্ত্রণে ৯ ফেব্রুয়ারি তাঁর সাথে সম্মানিত অতিথি আহমদনগর যান। তখন ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ এ মহান ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় আহমদনগর জামাতের প্রথম সালানা জলসা। মোহতারম মির্যা সাহেবের এ আহমদনগর সফর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের একটি স্বপ্নের শুভ বাস্তবায়ন ও ঐতিহাসিক ঘটনা। এ প্রসঙ্গে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব তাঁর লিখিত 'আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব' পুস্তকে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারি মাসের এক ভোর বেলার তাঁর সেই স্বপ্ন ১৯৮৬ সালে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে তা পত্রস্থ করা হলো–

আহমদীয়াতের বিজয় এবং আরো আনুষঙ্গিক বহু বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করে আমি সবে শুয়ে ছিলাম। তখন স্বপ্নে আমার সম্মুখে গগণচুম্বী বিরাট এক মহাপুরুষকে

দেখতে পেলাম। আমি নিজেকে তাঁর সম্মুখে একান্ত ক্ষুদ্রকার এক মানুষ দেখলাম। আমি অনুভব করলাম যে, তাঁর মধ্যে আসমান-যমীনের সকল শক্তি পুঞ্জিভূত করে দেয়া হয়েছে এবং তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। অতঃপর আমি যেন তাঁর পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। শহর-বস্তি, মরু প্রান্তর, মাঠ ময়দান, খালবিল, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অতিক্রম করে যাচ্ছি। অবশেষে এক ছোট নদীর দক্ষিণ কিনারায় এক ঘাটে পৌঁছলাম। নদীতে পানি কম ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আগে আগে এবং আমি তাঁর পিছনে নদীতে নামলাম। দক্ষিণ কিনারায় এক ঘাটে পৌঁছলাম। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সেখানে গোসল করলেন এবং আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গোসল করলাম। অতঃপর তাঁকে এক বড় টার্কিস টাওয়াল পরা অবস্থায় দেখলাম। টাওয়ালের দুই পাড় ছিল নীল বর্ণের। তিনি ঘাট হতে উঠলেন এবং আমিও তাঁর পিছনে পিছনে উঠলাম। স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। এ স্বপ্ন আমাকে নিমিষে দেখানো হল এবং এটা আমার জীবনে গভীরভাবে দাগ কেটে গেল। আমি যখন উপরোক্ত স্বপ্ন দেখি, তখন আমি আমার নিজ দেশ ভারতের বাঁকুড়া জেলা শহরে পাটপুর মহল্লায় অবস্থিত ছিলাম।

১৯৬০ সালে আহমদনগর জামা'তের প্রথম সালানা জলসার আয়োজন করা হয়। তখন বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই.) ওয়াকফে জাদীদের নাজেম এরশাদ পদে ছিলেন এবং উক্ত সময় আমি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামা'তে আহমদীয়ার ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ ছিলাম। ঐ জলসায় যোগদানের জন্য আমি তাঁকে বিনীত আমন্ত্রণ জানাই এবং তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি আহমদনগরে শুভ পদার্পণ করেন এবং দুই দিন অবস্থান করেছিলেন।

তিনি যখন আসেন, তখন আহমদনগর মসজিদটি খড়ের ছাউনি ও বাঁশের বেড়ার দ্বারা নির্মিত ছিল। তিনি আমার খড়ের ছাউনি এবং বাঁশের বেড়ার বৈঠকখানায় অবস্থান করেন। এটা নিদর্শনস্বরূপ আজও রাখা হয়েছে। এই সুযোগে হুযূর (আইঃ)-কে আমি করতোয়া নদীতে গোসল করার জন্য আহবান জানাই। তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন। তিনি আগে আগে এবং আমি তাঁর পিছনে পিছনে। সেই পুরাতন স্বপ্নে দেখা করতোয়া নদীর দক্ষিণ তীরের ঘাট। আমার বাড়ির অদূরে সেই ঘাটে আমরা নামলাম। তিনি আগে নামলেন এবং আমি তাঁর পিছনে পিছনে নামলাম। অতঃপর গোসল করে পানি হতে যখন ঘাটে উঠলাম, তখন অবাক বিস্ময়ে দেখলাম ১৯৩৮ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই ঘাটে গোসলের পর মনোমুগ্ধকর নীল পাড় বিশিষ্ট যে টার্কিস টাওয়েল পরিহিত দেখেছিলাম, এটা সেই টাওয়েল। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই.)-এর পরনেও সেই মনোহর টাওয়েল। আমার ১৯৩৮ সালের স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে এই ঘাটে গোসল করতে দেখা এভাবে পূর্ণ হলো।

তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পৌত্র এবং বর্তমানে তাঁর চতুর্থ খলীফা। এই প্রকারে দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও ওয়ারিশ হয়ে তিনি ঐ স্বপ্ন পূর্ণ করেছেন। এই স্বপ্নে আনুসাঙ্গিক অপরাপর বিষয়ের সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, এই অধম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের ধারাবাহিক অনুগমনের দ্বারা তাঁর চতুর্থ খলীফার কাল পর্যন্ত খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করবে। এখানে উল্লেখ্য এই যে, এই অধম ১৯৬০ সাল হতে ওয়াকফে জাদীদের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একটানা ভাবে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে অদ্যাবধি সংযুক্ত রয়েছে। অতঃপর হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই.) আগে আগে এবং পিছনে পিছনে আমি ঘাট হতে উঠলাম। এই ঘটনার মধ্যে যে বিস্ময়ের বিষয়গুলো আছে, সেইগুলির সংঘঠন কে ঘটাইল? আজ হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর চতুর্থ খলীফা এবং তাঁর মধ্যে উত্তরোত্তর আসমান ও জমিনের সকল শক্তির প্রকাশ পাচ্ছে এবং অচিরেই আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া মোখালিফাত তাঁর মাধ্যমে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে আহমদীয়াতের সত্যতা প্রকাশিত হবে। ইন্‌শাআল্লাহ্। স্বপ্নে গোসল করা সকল প্রকার গ্লানিমুক্ত হওয়াকে বুঝায়। বর্তমানে জামা'তে আহমদীয়ার ওপর যে জগতজোড়া অগ্নি পরীক্ষা নেমেছে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আই.)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে ও আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফযলে ও সাহায্যে তা খন্ড খন্ড হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মধ্যে আসমান ও জমীনের সকল শক্তি পুঞ্জীভূত হওয়ার নিদর্শন প্রকাশিত হবে। এ অধম তাঁর কদমে অবস্থানের সৌভাগ্য লাভ করেছি এবং খেদমতে রত আছি। এতদ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের বিরাট প্রমাণ আমার ব্যক্তিগত জীবনে সুপ্রকাশিত। (আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব পুস্তক-২৮৬-২৮৭, ২৯৪-২৯৫)।

আহমদনগর সফর প্রসঙ্গে সেদিনের তিফল আজকের নাসের শরীফ আহমদ সাহেব স্মৃতিচারণে বলেন–

হুযূর আনোয়ার মির্যা সাহেব ১৯৬০ সালে সফরকালে ঢাকা থেকে ট্রেনযোগে দিনাজপুর পৌঁছেন। আমার পিতা মরহুম

মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। দিনাজপুর থেকে বাস যোগে তিনি পঞ্চগড়ে আসেন। ধাক্কামারায় পৌঁছুলে আহমদনগরের আনসার, খোদ্দাম ও আতফাল লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে হুযূর আনোয়ারকে স্বাগত জানান। তখন দিনাজপুর থেকে পঞ্চগড়ে বাসে পৌঁছুতে ৬ ঘন্টা সময় লাগত। তাঁকে ধাক্কামারা থেকে গরুর গাড়ি যোগে আহমদনগর আঞ্জুমানে নেওয়া হয়। তখন অত্র এলাকায় রিক্সা বা মাইক্রোবাস ছিল না। তিনি আমাদের খড়ের ছাউনি এবং বাঁশের বেড়ার তৈরী বৈঠকখানায় অবস্থান করেন। সে সময় এলাকায় পাকা ঘরবাড়ি বা ল্যাট্রিন ছিল না। তাঁর জন্য বাঁশ দিয়ে ল্যাট্রিন তৈরী করা হয়। কয়েকজন খাদেম তাঁর ঘরের উত্তর দিকে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে এবং দক্ষিণ দিকে আমার পিতা বোনদের নিয়ে নিজেই তাঁকে পাহাড়া দিয়েছেন। উল্লেখ্য তিনি খলীফা হওয়ার অনেক পরে এ বিষয় জানতে পেরে বিস্মিত হয়েছেন এবং আমার পিতার জন্য দোয়া করেছেন। আমার আম্মা নূরুন্নেছা বেগম নিজ হাতে পোলাও ও মুরগীর রোস্ট, খাসীর রেজালা, গরুর মাংস ও করতোয়া নদীর বিভিন্ন মাছ রান্না করে খাওয়ান। তিনি খুবই তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন এবং খুশী হয়ে রান্নার প্রসংশা করেন। বিশেষ করে তিনি পাতলা রান্না করা মশুরের ডাল খেয়ে খুবই খুশী হন। শুধু তাই নয়, এম.টি. এ-তে এক সাক্ষাতকারে তিনি খাওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাদেশের কম খরচে সুস্বাদু ভাল খাওয়ার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন।

আমাদের গরুর গাড়িতে করে তাঁকে জামা'তের বিভিন্ন মহল্লা ও আহমদীদের বাড়ি-ঘর দেখান হয়। তখন আহমদনগরের অধিকাংশ আহমদীরা গরীব ছিলেন। অনেকেই খড়ি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বিশেষ করে তিনি দারুল হাসেম মহল্লার (বর্তমান শালসিঁড়ি জামা'ত) আহমদীদের করতোয়া নদীতে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহে অবাক হয়েছেন। তিনি শখ করে নদীতে মাছ ধরেছেন। দরিদ্র আহমদীদের এ অবস্থার উন্নতির জন্য খাস দোয়া করেছেন। হুযূর আনোয়ারের দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তাআলা আজ আহমদনগরের আহমদীদের অনেক-অনেক উন্নতি দান করেছেন এবং এ উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। তৎকালীন পঞ্চগড় থানা সদর ছিল (বর্তমান জেলা শহর)। তিনি পঞ্চগড় সদরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পঞ্চগড় সদরে অবস্থিত মৌঃ সাইদুর রহমান সাহেবের পারিবারিক ওয়াক্তি মসজিদে নামায পড়েন।

আমার পিতা জামা'তের প্রয়োজনে রাবওয়ায় গেলে হুযূর আনোয়ার নিজের ঘরে মেহমান হিসেবে রাখতেন। তিনি আমার পিতাকে খুবই ভালবাসতেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করতেন। আমার ভাগিনী মরিয়ম বেগম অর্থাৎ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, মুরব্বী সিলসিলার কন্যা ২০০২ সালে লন্ডনে হুযূর আনোয়ারের সাথে মোলাকাতের সময় তিনি আহমদনগর জামা'তের খোঁজখবর নেন। আহমদনগর জামাতের অভূতপূর্ব উন্নতির কথা শুনে হুযূর বলেন, পূর্বের সেই দৃশ্য আর নেই। অর্থাৎ তিনি আহমদনগরের জরাজীর্ণ ও গ্রাম্য দৃশ্য তাঁর স্মৃতিপটে ধরে রেখেছিলেন।

আমার পিতার স্বপ্নের প্রতিটি অক্ষর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর আহমদনগর পদার্পনের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। গোটা পৃথিবীতে তাঁর আধ্যাত্মিক ও ঐশী শক্তিতে আহমদীয়াতের উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি লাভ হতে চলেছে। হুযূরের পবিত্র পদধূলির পরশে এবং দোয়ার ফযিলতে আহমদনগর জামা'ত আজ ফুলে-ফলে সুশুভিত। জামা'তের প্রতিটি মানুষের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তা অব্যাহত আছে। মহান আল্লাহ্ তাআলা হুযূর আকদাসের খিলাফত তথা কর্মজীবনকে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর পবিত্র আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মাদ সাহেবের মেয়ে নাসিরা সাদেক সাহেবা স্মৃতিচারণে বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খিলাফতের পূর্বে ১৯৬০ সালে যখন আহমদনগর আসেন তখন আমি চতুর্থ কি পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের বাড়ীতে তাঁর শুভাগমনে সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন। আমরা তাঁর খেদমতে ব্যস্ত হই। আমার আব্বা তাঁর নিরাপত্তার জন্য রাতে পাহারার ব্যবস্থা করেন। তাঁর অবস্থানরত ঘরের উত্তর দিকে ক'জন দায়িত্বশীল খাদেমকে পাহারায় নিয়োগ করা হয়। দক্ষিণ দিকে আব্বা আমরা তিন বোনকে নিয়ে সারারাত পাহারা দেন। অজানাকে জানার অধম্য উৎসাহী মানুষ মির্যা সাহেব তখন বিভিন্ন জিনিষ দেখেই এর নাম জিজ্ঞাসা করতেন। আমরা ভাই বোনেরা তা বলতাম। তিনি মুখস্থ করতেন। পরে তা আমাদেরকে শুনাতেন। এমনি ভাবে বাংলা ভাষায় অনেক ফুল ফল ও সব্জীর নাম এবং কথাবার্তা তিনি শিখেছিলেন। আমার ডাক নাম নুসি, নুসি বলে তিনি খুব আদর করে আমাকে ডাকতেন। একদিন বলেন তোমরা কি সাঁতার পারো। আমি বলি পারি। তখন তিনি বলেন, চল নদীতে সাঁতার কাটবো। আমি আমার ছোট দুই ভাই শরীফ আহমদ ও বশির আহমদসহ তাঁকে নিয়ে করতোয়া নদীতে

যাই। সাঁতার শুরু করি। আমাদের অনেক আগেই তিনি নদীর অপর পাড়ে পৌঁছে যান। আমরা অনেক পিছনে পরে থাকি। এ দৃশ্যপটে তিনি পাড়ে বসে খুব হাসেন। সাঁতারে জয়ী হন। হাস্যোজ্জল নূরানী চেহারার সেদিনের তাঁর এ হাসী কখনও ভুলার নয়। তখন আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানতো না বঙ্গভূমির করতোয়া নদী পাড়ি দেওয়া এ মহান মানুষটি একদিন বিশ্বের শতকোটি মানুষকে পাড়ি দেওয়ার আধ্যাত্মিক জগতের কান্ডারী হবেন।

একদিন ভোরে তাঁর বিদায় লগ্নে আমাদের মন প্রাণ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। তবুও বিদায় দিতে হয়। আমরা তাঁর সাথে পায়ে হেঁটে বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত যাই। সেকালে রিক্সা বা স্কুটার ছিল না। হাটাই ছিল প্রধান অবলম্বন। তখন তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করে বলেন, চল তোমাকে আমি আমার মেয়ে বানিয়ে নিয়ে যাবো। আমি সরাসরি বলি না। আমি আব্বাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। উত্তর শুনে খুব জোরে হাসেন। বলেন–সাবাস বেটী।

আমার বিয়ের পর ষাট দশকের মাঝামাঝিতে আমি আব্বা ও স্বামী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরব্বীর সাথে রাবওয়া জলসায় যাই। সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশী হন। অত্যন্ত স্নেহভরা কণ্ঠে আদর করেন। আমাদেরকে প্রথমে একটি স্কুলে এবং জলসার পর তাহরীকে জাদীদের দপ্তরের দু'তলায় থাকার ব্যবস্থা করেন। তিনি নিয়মিত খোঁজ খবর রাখেন। এমনকি তাঁর তিনটি মেয়েকে প্রত্যহ বিকালে আমরা কেমন আছি জানার জন্য পাঠাতেন। তখন আমার বড় মেয়ে মরিয়মের বয়স ১১ মাস এবং দ্বিতীয় মেয়ে গর্ভে ছিল। তিনি প্রতিদিন সকালে আমাদের জন্য নাস্তা তাঁর বাসা থেকে প্রেরণ করেন। ১৫/২০ দিন থাকার পর ঢাকায় ফিরে আসার কথা তাঁর নিকট পেশ করি। তখন তিনি বলেন–তোমার আব্বা ও স্বামী চলে যাক। তুমি তোমার ডেলিভারী পর্যন্ত এখানে থাকো। আমি ও আমার বেগম সাহেবা তোমার সেবা যত্ন করবো। আমার না সম্মতিতে তিনি বলেন–তোমাকে দু'দিন চিন্তা করার সুযোগ দিলাম। দু'দিন পর আমি তাঁর নিকট আরজ করি–এখানে একা থাকতে পারবো না। আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে। তখন তিনি বলেন, তোমাকে শাস্তি দিতে হবে, তুমি কি রাজী আছো। আমি বলি জি। তিনি বলেন, প্রত্যহ হাসপাতালে মেডিকেল চেকআপ করাবে। সতর্কতার সাথে চলাফেরা করবে। পরের দিন রাবওয়া হাসপাতালে স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা নিরীক্ষা করাই এবং রিপোর্ট তাঁকে দেখাই। আর একদিন লাহোর হাসপাতালে চেকআপ করাই এবং রিপোর্ট তাঁকে জানাই। পরে তাঁর অশেষ দোয়া ও স্নেহ মমতা নিয়ে ঢাকায় চলে আসি। আমি বাল্যকাল থেকে হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নিকট হতে পিতৃতুল্য স্নেহ ভালবাসা ও দোয়া পেয়েছি। কেননা তিনি আধ্যাত্মিক জগতের আমাদের পিতাই ছিলেন। তাঁর স্নেহাশীষ কখনো ভুলতে পারি না।

সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের পদচারণে আহমদনগর জামা'তের জলসা সার্বিকভাবে সফল হয়। তিনি আহমদনগরে সালানা জলসার প্রথম দ্বার উন্মোচন করেন। যার প্রবাহমান ধারা বর্তমান রয়েছে। জলসার দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব একটি বিবাহ পড়ান। পাত্র রাজশাহী জেলার মাহমুদনগর নিবাসী মৌলভী ছহির উদ্দিন সাহেবের পুত্র মোহাম্মদ মফিজুল ইসলাম এবং পাত্রী আহমদনগরের স্থানীয় অধিবাসী মৌলভী আবু তাহের সাহেবের কন্যা জরিনা খাতুন। সকলের উপস্থিতিতে বিবাহের কামিয়াবীর জন্য তিনি খাস দোয়া করেন।

সফল জলসা সমাপ্তির পর মির্যা সাহেব ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ সফরে যান। তখন তাঁর সম্মানে স্থানীয় জামা'ত বিশেষ আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। তিনি বাঙালিদের অতিথি সেবায় অভিভূত হন। সেবাব্রতরাও তাঁর নসিহতমূলক বক্তৃতা, দোয়া ও ভালবাসায় ধন্য হয়।

তখন ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪১তম সালানা জলসায় সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের উপস্থিতি, সভাপতিত্ব ও ভাষণদান কর্মসূচীকে স্বার্থক ও প্রাণবন্ত করে তোলে। শ্রদ্ধাঞ্জলি ও ভালবাসার হৃদ্যতায় বাঙালিদের প্রতি তাঁর গভীর প্রেম বন্ধন সৃষ্টি হয়। এ জলসার সাথে প্রত্যক্ষ বাদ মাগরিব প্রাদেশিক জামা'তের মজলিসে শূরার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সাহেবযাদা মির্যা সাহেবের শূরায় অংশগ্রহণে কর্মসূচী হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে। সে সময় মির্যা সাহেবের আহ্বানে এদেশের ধর্মপরায়ণ যুবক আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব নিজেকে ওয়াকফে জাদীদের অনারারী মোয়াল্লেম হিসাবে পেশ করেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (সানী) কর্তৃক তা মঞ্জুরীর প্রেক্ষিতে তিনি আজীবন ইসলামের খেদমত করেছেন। শূরার কর্মসূচী শেষে বাঙালি আহমদীদের হৃদয় জয় করা মানুষ মির্যা সাহেব ঢাকা থেকে রাবওয়ায় ফিরে যান। (চলবে)।

16 January 2009

PRESS RELEASE

As the war in Gaza nears its fourth week, the Ahmadiyya Muslim Jamaat takes this opportunity to condemn the continued attacks which are leading to a humanitarian disaster. Innocent men, women and children are losing their lives on a daily basis due to the brutality of the occupying force. Whatever action is being taken is wholly disproportionate and cruel.
The world Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad has cautioned that the current conflict in Gaza could yet escalate further. He said:

“I have always said that if fairness and justice does not prevail then the world is facing a grave disaster. If we wish to save our future generations from the horrific effects of war then we must act now and with justice. Otherwise, I fear, the current situation may not remain limited to just one or two countries but could escalate into a global war, the result of which would be truly devastating."

It is of note that during the current crisis the majority of the Muslim world has remained silent and it has been left to academics, politicians and various organisations in the West to condemn what is happening in Gaza. The Muslim world should be grateful to all of them for displaying the courage and conviction to speak out against such atrocities. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

“The cruelty of the Israelis is progressively increasing. Indeed many people who had previously offered their support are now turning against them. Those countries who remain silent are actually assisting with this cruelty."
The Ahmadiyya Muslim Jamaat views with utmost concern the growing humanitarian disaster that is occurring in Gaza. The community is committed to alleviating this suffering. Commenting upon this, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad said:

“The situation in Gaza is getting worse and worse. We see that innocent children, women and the elderly are being killed on a daily basis. The United Nations and other organisations such as Save the Children have been given limited access to provide aid. Members of the Ahmadiyya Muslim Jamaat should individually support such organisations to the best of their ability and on a collective level our own charity, Humanity First, will also do so."
The Ahmadiyya Muslim Jamaat wishes to be clear that it is a peaceful community who harbours no political agenda or ambition. It wishes only to serve the world by spreading its message of peace. Amidst the current conflict, the community's motto of, 'Love for All, Hatred for None', is ever more resonant. The community desires and prays for peace in Gaza and in all other troubled parts of the world. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad continued:

“May God protect and safeguard the world from self-destruction and calamity. May peace prevail and may the world be saved from all forms of war and terror."
The Ahmadiyya Muslim Jamaat also wishes to remind all concerned, that in the past whenever the name of Islam has been used to justify any form of terror or extremism, the Jamaat has always condemned such acts without hesitation and it will continue to do so in the future. In this respect the Jamaat is forever guided by the Qur'anic injunction that 'There should be no compulsion in religion'.

End of Release

Further Info: Abid Khan, Press Secretary AMJ International (press@ahmadiyya.org.uk) / (UK) 07795490682

প্রেস ডেস্ক

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

১৬ জানুয়ারী ২০০৯

ইন্টারন্যাশনাল

প্রেস রিলিজ

'গাজা'-র যুদ্ধ ৪র্থ সপ্তাহে উপনীত হচ্ছে। মানবতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে এই অবিরত হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত। নিরীহ জনগণ - নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলেই প্রতিদিন অঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে ইসরাইলের আগ্রাসী বাহিনীর এই নির্মম আক্রমনে। যা কিছুই ঘটানো হচ্ছে তার সবটাই নির্দয়, নিষ্ঠুর আর সম্পূর্ণ অসম যুদ্ধাংদেহী আচরণ বৈ কিছু নয়।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এর খলীফা হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) গাজায় চলমান সংঘর্ষ আরও ব্যাপকতর রূপ নিতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, " সর্বদাই আমি বলে আসছি যে সমতা ও ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা না হলে বিশ্ব চরম বিপর্যয়ের মুখে পতিত হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে চাইলে আমাদের এখনই ন্যায়পরায়ণতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। নইলে আমি আশঙ্কা করছি বিদ্যমান পরিস্থিতি কেবল এক বা দুটি রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে আর বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেবে যা বাস্তবে পরিণত হবে এক চরম ধ্বংসযজ্ঞে" ।

এটি লক্ষণীয় যে চলমান এই সংকটে মুসলিম বিশ্বের বৃহৎ অংশ নিশ্চুপ রয়েছে আর পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংগঠন, রাজনীতিবিদ, গবেষক ও প্রাজ্ঞজনেরা গাজায় যা ঘটছে তার জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করছে। ইসরাইলের এই আগ্রাসী হামলার প্রতিবাদে নিন্দা জ্ঞাপন করার যে সাহস তারা দেখিয়েছেন এজন্য মুসলিম বিশ্বের তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।

হযরত মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, "ইসরাইলীয়দের নির্মমতা প্রকট থেকে ক্রমেই প্রকটতর হচ্ছে। বহু লোক, যারা পূর্বে তাদের সমর্থন করতো এখন তারাই তাদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এসময় যে সব রাষ্ট্র নীরব ও নির্লিপ্ত থাকছে প্রকৃতপক্ষে তারা ইসরাইলের ঐ নিষ্ঠুর নির্মমতাকেই সাহায্য করছে"। আহমদীয়া মুসলিম জামাআত মানবতার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী যে ঘটনা গাজায় সংঘটিত হচ্ছে তাতে গভীরভাবে উৎকণ্ঠিত। তাই আহমদীয়া মুসলিম জামাআত দুঃখ, কষ্ট ও দুর্ভোগে নিমজ্জিত যুদ্ধ প্রপীড়িত জনগোষ্ঠীর মঙ্গল সাধনে সদা নিবেদিত। এ প্রসঙ্গে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন, "গাজার সার্বিক অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হচ্ছে। নিরীহ মানুষ-শিশু, নারী আর বয়ঃবৃদ্ধ জনগণকে অবলীলায় হত্যা করা হচ্ছে যা আমরা প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করছি। জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা যেমন সেইভ দ্য চিলড্রেন-কে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত প্রবেশাধিকার দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় আহমদীয়া মুসলিম জামাআতের সদস্যদের ব্যক্তি পর্যায়ে গাজায় সাহায্য দানকারী এমন সংগঠন বা সংস্থাকে তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দ্বারা সাহায্য ও সহায়তা দান করা উচিত। আবার সমষ্টিগতভাবেও সাহায্য করা উচিত, যেমন আমাদের নিজস্ব সংগঠন হিউম্যানিটি ফার্ষ্ট স্বেচ্ছাশ্রমে সেবাদানকারী এক সংগঠন। এদেরও সেভাবে সাহায্য করা আবশ্যক"। আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সুস্পষ্টভাবে এটা জানিয়ে দিতে চায় যে-এরা শান্তিপ্রিয় একটি জামাআত যাদের রাজনৈতিক কোন কর্মসূচী বা উচ্চাভিলাস নেই। গোটা বিশ্বে কেবলই শান্তির অমিয় বাণী ছড়িয়ে দিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতে আর যুদ্ধ-বিগ্রহে সংক্ষুব্ধ এ বিশ্ব মাঝে এ জামাআতের মূল মন্ত্র হল-**ভালোবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে-** যা হল সদা ছন্দময় ও পূর্ণ বাঙময় প্রতিধ্বনিত মহান এক বাণী। গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটা এ জামাআতের ঐকান্তিক বাসনা আর এজন্য তারা সর্বদা দোয়াও করে থাকে। গাজাসহ বিশ্বের অন্যান্য অস্থির এলাকাগুলোতেও শান্তি কায়েম হোক। হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন, "আত্মবিনাশের এই মহা দুর্যোগ থেকে আল্লাহ তাআলা বিশ্বকে সুরক্ষা দিন ও নিরাপত্তা দান করুন। শান্তির বিস্তার ঘটুক আর সুরক্ষিত হোক এই বিশ্ব। বিশ্ব সর্ব প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ ও ধ্বংস সাধনকারী সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে মুক্তি লাভ করুক"।

আহমদীয়া মুসলিম জামাআত সংশ্লিষ্ট সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চায় যে অতীতে সংঘটিত যে কোন প্রকার সন্ত্রাসী ও চরম কার্যকলাপ যা-ই ইসলামের নামে ন্যায় সঙ্গত বলে চালিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছে, নিঃসঙ্কোচে নির্দ্বিধায় সর্বদা ঐসব কর্মকান্ডের নিন্দা করেছে এই জামাআত এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বদা অক্ষুন্ন থাকবে। এ প্রসঙ্গে এ জামাআত চিরকাল কুরআনের সেই বিধান-**"ধর্মে কোনই জোর জবরদস্তি নেই"** এ নীতিতেই পরিচালিত হতে থাকবে। (ইনশাআল্লাহ)

[ভাষান্তরিত]

মসজিদে যারা জুতা ছোড়াছুড়ি করে তারা কোন্ মুসলমান?

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) শান্তির অমীয় বাণী নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। মহান খোদার এক নাম ছালাম অথ্যাৎ শান্তি। বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকর্তা মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করেছেন। সকল মুসলমানই একে অন্যকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে থাকেন, অথ্যাৎ একে অপরের জন্য শান্তি কামনা করেন। প্রকৃত শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম ধর্মের নিষ্ঠাবান শান্তিপ্রিয় অনুসারী মুসলমান কখনও অন্যের জন্য অশান্তির কারণ হতে পারে না। মূল কথা হল, প্রকৃত মুসলমান যারা তারা কখনও মানব সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে না।

এ পৃথিবীতে এমন কোন ধর্মাবলম্বী মনে হয় পাওয়া যাবে না যাদের কোন নিজস্ব উপাসনালয় নেই। বিভিন্ন মত ও পথের এবং নানা বলয়ে বিভক্ত ও বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের লোকদের পৃথক ধর্মীয় উপাসনালয় রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের লোকজন তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও নিজস্ব চিন্তাধারা অনুযায়ী এবং তাদের উদ্ভাবিত বিধিবিধান, নীতিমালা, ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতি মোতাবেক স্ব-স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে। চলার পথে হিন্দু, বৌদ্ধ,খ্রিষ্টান, ইহুদী, শিখ ও বাহাই প্রভৃতি ধর্মের উপাসনালয় দৃষ্টিগোচর হয়। সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছে এ সকল ধর্মস্থান বা উপাসনালয় খুবই পবিত্র এবং আরাধনার নির্ভরযোগ্য স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। কোন বিবেকবান ধর্মানুরাগী ও মানবতাবাদী মানুষ যে কোন ধর্মীয় মতাদর্শের পবিত্র স্থানের অবমূল্যায়ন করতে পারে না। তবে এক শ্রেণীর লেবাসধারীদের কথা ভিন্ন। তাদের ভেতর বাহির অনেক তফাৎ।

গত দুই শুক্রবার ধরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুমার নামাজে ইমামতি নিয়ে দুজন খতিবের সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি ও জুতা ছোড়াছুড়ির ঘটনা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। এতে কেবল আল্লার ঘরের পবিত্রতাই ক্ষুণ্ন হয়নি, সকল ধর্মপ্রাণের হৃদয়ে মারাত্মক আঘাত হেনেছে। এ ধরনের ঘটনা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ঘটরার শুরু গত শুক্রবারের আগের শুক্রবার (০৯/০১/০৯) বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের অভ্যন্তরে শুক্রবার জুমার নামাজে ইমামতি করাকে কেন্দ্র করে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত খতিব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং ভারপ্রাপ্ত খতিব মুফতি নুরুদ্দিন সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি, জুতা মারামারিসহ তুমূল সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে সাধারণ মুসল্লিদের অনেকেরই জামা-কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ায় তারা নামাজ না পড়েই বের হয়ে আসেন। এই সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহতও হয়। আগের শুক্রবারের ন্যায় গত শুক্রবারও (১৬/০১/০৯) নামাজের আগে জুতো নিক্ষেপ ও হাতাহাতির ঘটনাও ঘটে। সাধারণ মুসল্লিরা কিল-ঘুষি মেরে জুতো নিক্ষেপকারী গ্রুপটিকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। হাঙ্গামা সৃষ্টির পর খতিববিরোধী একটি গ্রুপ মসজিদ থেকে বের হয়ে গিয়ে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটের রাস্তায় আলাদা জামাতে জুমার নামাজ আদায় করে এবং নামাজ শেষে রাস্তায় একটি মিছিল বের করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। জানা যায়, সাবেক খতিব উবাইদুল হকের মৃত্যুর পর মুফতি নুরুদ্দিনই ভারপ্রাপ্ত খতিবের দায়িত্বে ছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যাবার আগে গত ১ জানুয়ারি মহাখালী গাউসুল আযম মসজিদের ইমামের মোহাম্মদ সালাউদ্দিনকে নতুন খতিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে যায়। নতুন এই খতিবকে কেন্দ্র করেই গোলযোগের সুত্রপাত। প্রতিবাদকারী গ্রুপটি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মোঃ ফজলুর রহমানের মদদপুষ্ট বলে অভিযোগ রয়েছে।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ভিতরে হাতাহাতি ও জুতা ছোড়াছুড়ির এ ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা এবারই প্রথম হলেও এর পূর্বে বিভিন্ন সময় দেখা গেছে ধর্মভিত্তিক কিছু রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে জঙ্গি রুপ ধারণ করে জিহাদি মিছিল বের করে। সব সময় তারা মসজিদের গেটে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ করে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার দাবী নিয়ে রাজ পথ অবরোধ করে রাখে এমনকি প্রায়ই পুলিশের সঙ্গে মারামারির ক্ষেত্রে মসজিদের ভেতরটা কখনো কখনো রাজনৈতিক কর্মী ও পিকেটারদের আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করেছে।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিবের পদটি সরকারি। সরকারের

সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্দিষ্ট কিছু বিধিবিধানের ভিত্তিতে এই পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এটা সরকারেরই দায়িত্ব। সরকার একজন নতুন খতিব নিয়োগ দিয়েছে, কিন্তু এ নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে কেন তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। এর পেছনে অবশ্যই রাজনৈতিক কোন অভিসন্ধি রয়েছে। মসজিদ সবার ইবাদতের স্থান, মসজিদকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত করা কারো কাম্য নয়।

প্রত্যেক মুমিনের কাছে প্রাণস্বরূপ হলো মসজিদ। তাদের কাছে একটি মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। নিরিবিলি ও একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের জন্য নির্ভরযোগ্য স্থান হলো মসজিদ। মু'মিনরা যত বেশী মসজিদে এসে ইবাদত করবে ততো বেশী তাদের রুহানী উন্নতি, অগ্রগতি ও উৎকর্ষতা ঘটবে এবং নৈতিক মান সমুন্নত হয় এটাই ইসলামের শিক্ষা।

পবিত্র মসজিদে সকল আধ্যাত্মিক আলোকদীপ্ত কার্যক্রম একজন ইমামের নির্দেশনায় পরিচালিত হয়। দেশের সকল ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী মুসলমানরা মসজিদে নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে থাকেন। সবাই মনে করেন, আল্লাহর ঘর মসজিদই সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ স্থান। কিন্তু আজ আমারা কি দেখছি? পবিত্র স্থান আল্লাহর ঘরেও শেষে জুতা ছোড়াছুড়ির দৃশ্য আসলেই খুব দুঃখজনক। আজ মসজিদে গিয়েও এক শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। কারা দায়ী এর জন্য? মূলত তারাই এসব কর্মকান্ডের জন্য দায়ী যারা শান্তির ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সব সময় ব্যবহার করে আসছে। দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র স্থান হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ। সে ঘরেও আজ মানুষ নিরাপদ নয়। নতুন পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে মসজিদে যায় আর ফিরে আসতে হয় ছেড়া জামা আর রক্তমাখা শরীরে। শুক্রবার হলেই দেখা যায় মসজিদে মসজিদে পুলিশ অস্ত্র নিয়ে কড়া পাহারায় দণ্ডায়মান। প্রশ্ন হলো, আমরা কি এতই বর্বর যে, আমাদের ইবাদত খানায় পুলিশ শৃংখলা ও নিরাপত্তার দায়ীত্বে রত থাকতে হবে?

যারা মসজিদ বা যে কোন উপাসনালয়ে হামলা চালায়, ভাঙচুর করে, লুন্ঠন করে, তাতে ইন্দন যোগায়, মানুষকে লাঞ্ছিত করে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বা প্ররোচনা দেয়, শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ করে তারা কি সেই শ্রেষ্ঠ নবী (সা.)-এর উম্মত হবার দাবী করতে পারে?

আমাদের দেশে অনেক পূর্ব থেকেই এক প্রকার উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে দেশের শান্তি শৃংখলা সব সময়ই নাজুক থাকে। দেশের শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত করার মূলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি আর ধর্ম ব্যবসায়ীরাই দায়ী। এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা পবিত্র ইসলামকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে সব ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যায়। এদের ন্যক্কারজনক কার্যক্রমের কথা দেশের ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠীর অজানা। তাদের নূরানী চেহারা, মুখ ভর্তি দাড়ি, বেশবাস দেখলে মনে হবে না জানি কত আল্লাহ ওয়ালা লোক। আসলে তারা যে ইবলিসের চেয়েও জঘন্য তা আমরা বুঝি না। আর না হয় মসজিদের মত পবিত্র স্থানে এমন জঘন্যতম কাজটি তারা কেমন করে করতে পারে। জুতা সবার পায়েই মানায়, কারো গায়ে ছোড়ার জন্য নয় আবার তা পবিত্র স্থান মসজিদে। যখনই জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ভিতরে হাতাহাতি ও জুতা ছোড়াছুড়ির কথা মনে পড়ে তখন যেন গা শিউরে ওঠে। মানুষ এত নিচে নামে কি করে? নামাজ আদায় করতে গিয়ে জুতার আঘাতে দাঁত, পিঠ ও কোমর জখম হোক আর জামা কাপড় ছিড়ে আসা এটা আমাদের কাম্য নয়।

আমাদের সবার দায়ীত্ব এই বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী জঙ্গিদের প্রতিহত করা। আমরা যেভাবে প্রতিহত করেছি এবার বেলট পেপারের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের পরাজিত করে এমন ভাবেই ঐক্য হয়ে এদেশের সকল মৌলবাদীদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে দৃঢ় পতিবাদ তুলে। যারা মসজিদসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুবিধার্থে ব্যবহার করে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত আর না হয় এমনই ভাবে জুতা ছোড়াছুড়িই শুধু চলবে না বরং রক্তের বন্যা যে বইবে তা নিশ্চিত। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ধর্ম পালনের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে। তাই আসুন, আর বিভেদ সৃষ্টি না করে, আল্লাহর মনোনীত শান্তিপ্রিয় ধর্ম সঠিক ভাবে পালন করার চেষ্টা করি। শান্তির ধর্ম 'ইসলাম' আবারও শান্তিতে রূপায়ীত হোক, দেশের সকল জঙ্গি মৌলবাদ ধ্বংস হোক, সন্ত্রাস দূর হোক, মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা হোক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

[দৈনিক সংবাদ, ২৪/০১/২০০৯ এর সৌজন্যে]

জামা'ত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

তেজগাঁও জামা'তের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তালীম তরবিয়তী ক্লাস উদযাপন

গত ৫/১২/০৮ইং তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও এর উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে সভাপতিত্ব করেন তেজগাঁও লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট মিসেস নিলুফা বেগম। কেন্দ্র থেকে যোগদান করেন, মোহতারমা মাহমুদা আখতার জেনারেল সেক্রেটারী, মোহতারমা রওশন জাহান তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারী এবং মোহতারমা নূরুন নাহার খেদমতে খালক সেক্রেটারী। কুরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে ওসীয়্যতের গুরুত্বের ওপর আলোচনা ও পরীক্ষা নেওয়া হয় ও সহীহ্ কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়। ১০ জন লাজনা ও ২ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিল। আপ্যায়ন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নিলুফা বেগম

প্রেসিডেন্ট,লাজনা ইমাইল্লাহ্

তেজগাঁও, ঢাকা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ১৫-০১-০৯ইং তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে বানরগাতী'তে মোহতারম আমীর সাহেবের বাসায় এক তবলীগি সেমিন-ার অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন মোহতারমা দীনা নাসরিন, মোফাত্তিস, খুলনা বিভাগ। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন রোখসানা মঞ্জু। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা। উক্ত অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয় ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব, সন্তানের তরবিয়ত, মহানবী (সা.) এর জীবনী, এবং ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব এবং তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব। উক্ত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন, মোহতারমা দীনা নাসরীন সাহেবা। মোহতারম শামছুর রহমান সাহেব, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, মাওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ মুবাশ্বের মুরুব্বী। এই অনুষ্ঠানে ৪০ জন জেরে তবলীগ ও ২০ জন আহমদী ভাই ও বোন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে মাওলানা সাহেব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোহতারমা কোরায়েশা মাজেদ।

জহুরা তাজনীদ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা

দোয়া চাই

"আন্তর্জাতিক এলানে নিকাহ্"

(ইয়ে রোজকার মোবারক সুবহানা মাইয়্যারানী)

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মহান আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত ও ফজলে গত ১৩ জানুয়ারী ২০০৯ইং (২৯শে পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ১৫ মহরম ১৮৩০ সাল) রোজ মঙ্গলবার বাদ নামায মাগরেব ঢাকাস্থ বকশি বাজার দারুত তবলীগ মসজিদে ইমরান আহমদ (রিয়েল) পিতা-প্রকৌশলী জনাব শরীফ আহমদ বর্তমান ঠিকনা- ১২ এ, ক্যাপ্টেন স্কট রোড, গ্লেন ইডেন অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডের সাথে মিস ফারজানা আক্তার (ঊষা) পিতা-জনাব এ,কে, এম, আতাউর রহমান, বর্তমান ঠিকানা- ১৩৯/১-বি, উত্তর মুগদা পাড়া, মদিনাবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ এর সাথে ৫,৫০,০০১.০০ দেন মোহরানায় শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মুরব্বী সিলসিলা মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী মিশনারী ইনচার্জ ও নায়েব ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, উক্ত বিবাহের এলান করেন। অতঃপর মোহতারম জনাব মোবাশ্‌শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এই বিবাহ যেন আন্তর্জাতিক আহমদীয়া বিশ্বের উত্তম সেতু বন্ধন তৈরী হয় ও উভয় পরিবারে ভবিষ্যতে সুখ-শান্তি সুনাম, সৌন্দর্য্য, ঐতিহ্য মজবুত ও বৃদ্ধি পায় তার জন্য সম্মিলিত দোয়া করেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে বহু বুযুর্গ, কর্ম-কর্তা, সেক্রেটারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ জামা'তের শতাধিক সদস্য উপস্থিত থেকে দোয়ায় শরীক হন। দোয়া শেষে সকলকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ণ করা হয়।

শফিক আহমদ

নায়েব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্

বাংলাদেশ

এ পক্ষের কৃষি

১লা ফেব্রুয়ারী হতে ১৫ ফেব্রুয়ারী

চাষী ভাই, এ পক্ষে নিম্নবর্ণিত কাজগুলি করতে পারেন ঃ

১) বোরো চাষ ঃ এ পক্ষকালের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বোরো চারা রোপন শেষ করুন। চারা রোপনের পূর্বে জমি চাষ ও মই দিয়ে উত্তম রূপে প্রস্তুত করুন। শেষ চাষে সুষম মাত্রায় ইউরিয়া সার বাদে বাকী সার নিম্নোক্ত হারে প্রয়োগ করুন। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করুন।

জৈবসার	২০০০ কেজি/একর
ইউরিয়া	৯৬ কেজি/একর
টি এস পি	৫০ কেজি/একর
এম ও পি	৩৬ কেজি/একর
জিপসাম	২৪ কেজি/একর
দস্তা	২ কেজি/একর

চাষী ভাই, চারার বয়স ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে রোপন শেষ করুন।

২) গম চাষ ঃ এ পক্ষকালে প্রায় সব খেতে ফুল আসবে। ফুল আসার পূর্বে জমির জোঁ বুঝে তৃতীয় সেচ দিন। সেচ দেয়ার সময় দৃষ্টি রাখবেন যাতে খেতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়। বিশেষ করে ফুল আসা অবস্থায় জলাবদ্ধতা হলে ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যাবে।

এ পক্ষকালে জাব পোকার ব্যাপক আক্রমণ হবে। শীষের রস চুষে খেয়ে ফেলবে। ফলন কমে যাবে। তাই জাব পোকার আক্রমণ হওয়ার সাথে সাথে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে জাব পোকা দমন করুন।

যে খেত থেকে বীজ রাখবেন দানা বাঁধার সাথে সাথে সে খেত থেকে অফটাইপ এবং বিজাত বাছাই করুন।

৩) ভুট্টা চাষ ঃ যে সকল খেতের ফসলের বয়স ৬০-৭০ দিন হয়েছে সেসকল খেতে মাটির জোঁ বুঝে তৃতীয় সেচ দিন। যে সকল খেতের ফসলের বয়স ৮৫-৯৫ দিন হয়েছে সেসকল খেতে চতুর্থ সেচ দিন।

* ভুট্টার ফুল ফোটা এবং দানা বাঁধার সময় জমিতে যাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি না হয় সেদিকে যত্নবান হবেন।

৪) কুমড়া চাষ ঃ

(ক) মিষ্টি কুমড়া ঃ গ্রীষ্মকালীন মিষ্টি কুমড়া চাষের জন্য এ পক্ষকালে পলিপ্যাকে চারা করুন। ৮"X১০" আকারের পলিপ্যাক অর্ধেক মাটির সাথে অর্ধেক গোবর মিশিয়ে বয়স ১৬/১৭ দিন হলে মাঠে প্রস্তুতকৃত মাদায় রোপন করতে হবে।

পাকা মিষ্টি কুমড়া অনেকদিন রেখে খাওয়া যায়। এজন্য পরিপূর্ণ পাকা মিষ্টি কুমড়া তোলা প্রয়োজন। নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করে মিষ্টি কুমড়ার পরিপূর্ণ পরিপক্কতা নির্ধারণ করা যায়।

* পরিপূর্ণ পাকা ফল হলুদ অথবা হলুদ-কমলা অথবা খড়ের রং ধারন করবে

* ফলের বোটা খড়ের রং ধারণ করবে।

* গাছের ডগা শুকাতে শুরু করবে।

(খ) গেমী কুমড়া ঃ এ পক্ষকালে গেমী কুমড়ার খেতের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

৫) ডাল ফসল ঃ

(ক) মুগ ডাল ঃ দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাই এ পক্ষকালের মধ্যে মুগডাল বীজ বপন শেষ করুন। বপনের পূর্বে শেষ চাষে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ২০০ গ্রাম, টিএসপি-৩২৫ গ্রাম, এবং এমপি-১৪০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।

(খ) মুশুর ডাল ঃ এ পক্ষকালে দানা বাঁধা শেষ হবে এবং আগাম বপনকৃত ডাল পাকতে শরু করবে। যে প্লট থেকে বীজ রাখবেন দানা বাঁধার পরপরই সে প্লটের অফটাইপ, বিজাত এবং হিটকারী বাছাই করুন।

(গ) অন্যান্য ডাল ফসল অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা করুন। খেত প্রতিদিন পরিদর্শন করুন। এ পক্ষে কুয়াশা পড়বে, জাব পোকার আক্রমণ হবে। আক্রমণের প্রথম দিকে দমনের ব্যবস্থা নিন।

৬) আখ চাষ ঃ যে সকল চাষী ভাই আগাম আখ চাষ করতে পারেন নাই সে সকল চাষী ভাই এ পক্ষকালে আখ চাষ করতে পারেন। আগাম চাষকৃত আখ খেতের পরিচর্যা করুন। এ সময়ে আখে রস কমে থাকে ফলে চারা গজাতে দেরী হয়। তাই বপনের পূর্বে আখ আঁটি বেঁধে পুকুরের পানিতে সারারাত ভিজিয়ে পরদিন বপন করলে গজানোর হার বৃদ্ধি পাবে।

৭) কলা চাষ ঃ যে সকল চাষী ভাই কার্তিক মাসে কলার চাষ করতে পারেন নাই সে সকল চাষী ভাই এ পক্ষকালে কলার চাষ করতে পারেন।

৮) শীতকালীন সব্জি চাষ ঃ যে সকল শীতকালীন সব্জি যেমন লালশাক, পালংশাক এর বীজ রাখার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন সে সকল খেতের ফসল এর অফটাইপ রগিং এবং বিজাত বাছাই করার এখনই সময়।

৯) গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষ ঃ চাষী ভাই, এপক্ষকালে ঢেঁরস, বরবটি, ডাঁটা, ঝিংগা, শশা, চিচিংগা, চাল কুমড়া এবং পুঁইশাক আবাদ করার উপযুক্ত সময় ।

(ক) পিঁয়াজ চাষ ঃ এ পক্ষকালে পিঁয়াজের চারা রোপন শুরু করুন।

(খ) দক্ষিণ অঞ্চলে এ মৌসুমে মরিচ চাষ করা হয়ে থাকে। খেতের আগাছা পরিষ্কার করুন। গাছের গোড়া থেকে আলগা মাটি সরিয়ে দিন। কাছ কাটা লেদা পোকার আক্রমণ কম হবে। খেতে কঞ্চি/ ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে দিন।

(গ) দক্ষিণ অঞ্চলের চাষী ভাইয়েরা, এপক্ষকালে সেচ সুবিধাযুক্ত উচু জমিতে বরবটি, ডাটা, ঢেঁরস, পুই শাক চাষ করতে পারেন।

(ঘ) এপক্ষকালে শশা, চিচিংগা, চাল কুমড়া চাষ করার জন্য মাদা তৈরী করুন। মাদায় জৈব সার সহ সুষম মাত্রায় অন্যান্য সার প্রয়োগ করুন।

১০) গোল আলু ঃ আলু যদি দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে চান তাহলে আলুর চামড়া শক্ত হতে দিতে হবে। এজন্য আলু তোলার ৭/৮ দিন পূর্বে হার্মপুলিং করা প্রয়োজন। গাছ মাটি সমতলে কেটে হার্মপুলিং করা যেতে পারে। গাছ এমনভাবে কাটতে হবে যেন নতুন কুশি গজাতে না পারে। সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হলো গাছের গোড়া সাবধানে চেপে ধরে আলু গাছ তুলে ফেলুন যেন আলু উপড়ে উঠে না আসে। উপরের গাছ অবশ্যই মাঠ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এপক্ষে ঘন কুয়াশা পড়বে। তাই যতদিন গাছ মাঠে থাকবে ততদিন লেইট ব্লাইট এবং জাব পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতিদিন অনুমোদিত কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করুন।

মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সেক্রেটারী জিরায়া'ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৯১৩৫২০৬৭